ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রকাশ কালঃ ১৮৬৯

Made with 💖 by টেলি বই 🇮🇳

✅ t.me/bongboi

এ ধরনের আরও বই পান ⏩ এখানে।

😺 Generated from WikiSource

1. পাতার শিরোনাম
2. ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস
3. প্রথম উপদেশ
4. দ্বিতীয় উপদেশ
5. তৃতীয় উপদেশ
6. চতুর্থ উপদেশ
7. পঞ্চম উপদেশ
8. ষষ্ঠ উপদেশ
9. সপ্তম উপদেশ
10. অষ্টম উপদেশ
11. নবম উপদেশ
12. দশম উপদেশ
13. সম্পর্কে

1. ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস
2. সম্পর্কে

ব্রাহ্মধর্ম্মের মত

ও

বিশ্বাস।

১৭৯১ শক।

ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস।

শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয় কর্ত্তৃক

১৭৮১ । ৮২ শকে

ব্রহ্মবিদ্যালয়ে

প্রদত্ত

দশ উপদেশ।

কলিকাতা

ব্রাহ্মসমাজের যন্ত্রে মুদ্রিত।

তৃতীয় বার।

১৭৯১ শক।

উপক্রমণিকা।

পরমেশ্বর আমাদের জ্ঞানের সমুদায় কার্য্য কেবল আমারদের বুদ্ধির হস্তে সমর্পণ করিয়া রাখেন নাই। তিনি যদি আমারদিগকে ক্ষুধা-তৃষ্ণা না দিতেন, আর আমারদের বুদ্ধি ও বিবেচনা করিয়া শরীর পোষণ করিতে হইত, তাহা হইলে আমারদের যেরূপ দুর্দশা হইত; সেই রূপ প্রত্যেক জ্ঞান-ক্রিয়া যদি কেবল আমারদের বুদ্ধির হস্তে থাকিত, তাহা হইলেও আমরা পদে পদে দুর্দ্দশা-গ্রস্ত হইতাম। যদি যুক্তি ও তর্ক এবং বুদ্ধি ও শাস্ত্রের সাহায্য ব্যতিরেকে ঈশ্বরকে জানা না যাইত—যদি সমুদায় দর্শন শাস্ত্র উদঘাটন করিয়া না দেখিলে আমাদের ধর্ম্মজ্ঞান জন্মিত; তবে পৃথিবীর অধিকাংশ লোকেই ধর্ম্ম ও ঈশ্বর হইতে বিচতি থাকিত। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে; আমারদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান যে রূপ সহজে হয়,

সেই প্রকার সহজ জ্ঞান অন্যান্য বিষয়েরও হইয়া থাকে। এই প্রকার সহজ জ্ঞান আমার ও তোমারও নহে, কিন্তু ইহা সকল মনুষ্যেরই সাধারণ সম্পত্তি।

আমরা দুই শ্রেণীর লোক সচরাচর দেখিতে পাই। কতকগুলি লোকের অতি তীক্ষ-বুদ্ধি; তাহারা তীক্ষতা সহকারে বস্তু-তত্ত্ব-সকল নির্ণয় করে, তাহারা এক বিষয়ের সকল দিক্ দেখিয়া বিচার করে, এবং অতি দুরূহ বিষয়-সকলও খণ্ড খণ্ড করিয়া স্পষ্টরূপে অবধারণ করে। অন্য কতকগুলি লোক ঠিক ইহার বিপরীত। তাহারা যদিও সুশিক্ষিত পণ্ডিতদিগের মত নিপুণ-রূপে বলিতে কহিতে পারে না, যদিও ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক বিচার করিতে পারে না; তথাপি তাহারদের স্বাভাবিক কেমন এক প্রকার ভাব যে তাহারদের মুখ হইতে সহজে যে সকল কথা বিনির্গত হয়, তাহা দেব-বাক্য তুল্য। যখন জন-সমাজের চতুর্দ্দিক অজ্ঞানান্ধকারে আবৃত থাকে, তখন সেই অন্ধকারের মধ্য হইতে যে এক এক প্রখর জ্যোতিষ্মান্ পুরুষ উথিত হয়েন; তাঁহাদের জ্ঞান উক্ত প্রকার সহজ জ্ঞান। তাঁহাদের অন্তর্দৃষ্টি অতি উজ্জ্বল। তাঁহারা অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, কি বহুবিধ গ্রন্থ পাঠ করিয়া, কোন বিষয় শিক্ষা করেন না বটে; কিন্তু বহির্দৃষ্টিতে বাহিরের বিষয়-সকল যেমন সহজে উপলব্ধি হয়, তাঁহাদের অন্তর্দৃষ্টিতে সত্যের প্রতিভা তেমনি সহজে পড়ে। যে সকল সময়ে এই রূপ এক এক মহাত্মা উদিত হন, তখনকার জুন-সমাজের অবস্থা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়, যে এমন আন্ধকারের মধ্য হইতে এ প্রকার তেজীয়ান্ পুরুষ কোথা হইতে আইলেন। ঈসা, নানক, মহম্মদ; এই সকল লোকের এই প্রকার ভাব।

এই প্রকার অন্তর্দৃষ্টিতে আমরা যে সকল জ্ঞান উপলব্ধি করি তাহা সহজ, সাক্ষাৎ, স্বাভাবিক; তাহা স্বতঃসিদ্ধ; তাহা মনুষ্যের সাধারণ সম্পত্তি। বাহিরের বস্তু-সকল আমরা যেমন সাক্ষাৎ দেখি, অতীন্দ্রিয় উচ্চতর বিষয়েরও আমাদের সেই রূপ সাক্ষাৎ জ্ঞান লাভ হইতে পারে। বিষয়-জ্ঞান আমারদের দুই প্রকারে উপলব্ধি হইতে পারে। হয়, আমরা কোন বস্তু চক্ষে দেখি; নয়, তাহা কোন গ্রন্থ মধ্যে বা অন্যের নিকট হইতে শিক্ষা করি। আমি যদি স্বচক্ষে এই বৃক্ষের শোভা দেখিয়া আমোদিত হই, তবে এই স্থলে আমার প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইল। কিন্তু আমি দেখি নাই, এমন এক বৃক্ষের বিষয় যদি কেহ আমার নিকটে বর্ণন করে; তবে এ স্থলে আমার জ্ঞান সাক্ষাৎ জ্ঞান নহে তাহা পরোক্ষ জ্ঞান। আমি তাহা জানিলাম বটে; কিন্তু সে জানা সাক্ষাৎ দেখার সঙ্গে এত প্রভেদ যে তাহাতে সংশয় জন্মিলে তাহা ভঞ্জন করিবার জন্য প্রত্যক্ষ জ্ঞান আবশ্যক।

আমরা জগতের প্রতি দৃষ্টি করিলে যে কেবল জড়ীয় গুণ সকল উপলব্ধি করি, তাহা নহে। শিশুর মন, যখন সে কথা কহিতেও শিক্ষা করে নাই, তখন তাহাকে নানা প্রকার ভাবে আকৃষ্ট হইতে দেখা যায়। প্রথমে সে যে কেবল আকৃতি,

বিস্তৃতি, বর্ণ, এই সকল দেখিতে পায়, তাহা নহে; কিন্তু নূতন নূতন বস্তুর শোভা দেখিয়াও আশ্চর্য ও আমোদিত হইতে থাকে। বিশ্বরাজ্য, শ্রী ও সৌন্দর্য্যে এ প্রকার বিভূষিত যে তাহাতে আমারদের দৃষ্টি পড়িবামাত্র আমারদের মন সৌন্দর্য্য রসে আর্দ্র হয়। সুন্দর বস্তু দেখিবা মাত্র আমরা সহজ জ্ঞানে তাহার সৌন্দর্য্য গ্রহণ করি। আমরা যখনি কোন সুরম্য পুষ্প, বা স্পৃহণীয় চন্দ্রমা, বা তারকা-সঙ্কুল-গগনের প্রতি দৃষ্টি করি; তখন আমরা কি দেখি? তাহাদের আকৃতি বিস্তৃতি প্রভৃতি যে তাহাদের জড়ীয় গুণ, কেবল তাহা দেখি না; তাহা আপেক্ষাও অধিক দেখি। সেই সকল জড় পিণ্ডের মধ্যে আমরা শোভা দর্শন করি। এই শোভার জ্ঞান আমারদের পরোক্ষ জ্ঞান নহে, তাহা প্রত্যক্ষ জ্ঞান; কিন্তু যখনি আমি সেই শোভা অন্যের নিকটে ব্যক্ত করি, অথবা তাহা দেখিবার পরে পুনর্ব্বার তাহা ভাবিতে যাই। ভামনি বুদ্ধি আসিয়া তাহার উপরে কার্য্য করিতে থাকে। সঙ্গীতের বিষয়েও এই রূপ। প্রথমে আমরা সহজ-জ্ঞান দ্বারা সঙ্গীত-রস গ্রহণ করি, তাহা যদি না পারিতাম। তবে সঙ্গীতের ব্যাকরণ বুঝাইয়া, সমুদায় সঙ্গীত-সূত্র নির্ব্বাচন করিয়াও কেহ আমারদিগকে সঙ্গীতের ভাব বুঝাইয়া দিতে পারিত না। কিন্তু আমি সঙ্গীত রসজ্ঞ হইয়া যদি সঙ্গীতের এক ব্যাকরণ রচনা করি, তবে সে স্কুলে তাহা বুদ্ধির হস্ত দিয়া বাহির হইল। শোভার জ্ঞান সঙ্গীতের ভাব, আমরা এমন সহজে পাই, যে শোভা দেখা, সঙ্গীত রস পান করা, ভাষায় এই সকল বাক্যই প্রচলিত হইয়াছে।

ধর্ম্ম এবং ঈশ্বরের বিষয়েও এই রূপ। আমাদের স্বাভবিক ধর্ম্ম-জ্ঞান প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ন্যায় অতি সহজ। আমরা স্বাভাবিক ধর্ম্ম-বুদ্ধি হইতে যে সকল বিষয় দেখিতে পাই, তাহা আর ছায়ার ন্যায় দেখি না, কিন্তু প্রত্যক্ষবৎ দেখি—কর্ত্তব্য, ন্যায়, সত্য, এ সকল কল্পনা মাত্র বোধ হয় না, কিন্তু এ সকলকে সার বোধ হয়—ঈশ্বর, পরকাল, এ সক।লের প্রতি বাহ্য বস্তুর ন্যায় আর কোন সংশয় থাকে না। কিন্তু আমি যদি কেবল ধর্ম্ম-শাস্ত্র হইতে ধর্ম্ম শিক্ষা করি— যদিও ঈশ্বর, পরকাল; পাপ পুণ্য; উপকার, অনিট; এই সকল শব্দ আমার মুখগ্রে থাকে; তথাপি হয় তো সে শিক্ষা কেবল মুখেই থাকে—সে ধর্ম্ম-জ্ঞান জীব-শূন্য নিষ্ফল হইয়া থাকে। যে পর্য্যন্ত না সেই শিক্ষিত বিষয়-সকল আমার জ্ঞাননেত্রের সন্মুখে আইসে—যে পর্য্যন্ত না আমি স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া সেই সকল বিষয় দেখিতে পাই, সে পর্য্যন্ত সে শিক্ষা কোন কার্য্যেরই নহে। এই হেতু এক সামান্য কৃষকের মুখ হইতে যে সকল ধর্ম্ম-নীতি বহির্গত হয়, তাহাতে এক মহা অধ্যাপকেরও প্রকৃষ্ট রূপে শিক্ষা হইতে পারে। এ স্থলে পণ্ডিত আর মুখ উভয়েরই সমান অধিকার। ঈশ্বরকেও আমরা জ্ঞান-নেত্রে প্রত্যক্ষ, উপলব্ধি করি। আমরা যদি কেরল যুক্তির সোপান দিয়া ঈশ্বরে যাই, তবে আমরা শূন্য ঈশ্বর মাত্র পাই। কেবল বুদ্ধির অলোক এ স্থলে অন্ধকার তুল্য। ঈশ্বরের অস্তিত্ব যতক্ষণ না আমরা তর্ক দ্বারা সিদ্ধান্ত করিতে পারি, ততক্ষণ যে আমরা ঈশ্বরকে জানিতে পারি না; এ কোন কায্যেরই কথা

নহে। জগৎ, আমি, ঈশ্বর, এ তিনেরই সত্তা আমাদের আত্ম-প্রত্যয়-সিদ্ধ; তাহা সিদ্ধান্ত সাপেক্ষ নহে, এবং সে সকলকে যুক্তি দ্বারা সংস্থাপন করিতেও পারা ঘায় না। আমরা কি জগতের অস্তিত্ব তর্ক দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়া পরে তাহা প্রত্যয় করি? যদিও সহস্র সহস্র প্রখর বুদ্ধি একত্র হইয়া বহুতর যুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক জগতের অস্তিত্ব খণ্ডন করিয়াছে; তথাপি কোন্ উন্মাদ এমন আছে, যে বাহ্য বস্তুর অস্তিত্বের প্রতি সংশয় করে। বিপক্ষের শত সহস্র যুক্তি ও তর্ক এ স্থলে পরাভব পায়। ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণও সেই রূপ তর্ক তরঙ্গের উপর নির্ভর করে না। আমি যখন তাঁহাকে জ্ঞান-নেত্রে প্রত্যক্ষ প্রতীতি করি; তখন আর আমি ছায়া দেখি না, তখন করতল-ন্যস্ত আমলকের ন্যায় তাঁহার সত্তা স্পষ্ট রূপে উপলব্ধি করি—তখন "ভিদ্যতে হৃদয় গ্রন্থি শ্চিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়ঃ" হৃদয়ের গ্রন্থি ভিদ্যমান হয়, সকল সংশয় নিরাকৃত হয়। এই স্বাভাবিক সহজ-জ্ঞান ব্যতীত কোন সত্যই আমাদের প্রত্যক্ষ গোচর হয় না। কোন প্রকার ব্যাখ্যাতে কেহ জন্মান্ধকে বর্ণ বুঝাইয়া দিতে পারে না— কোন বর্ণনাতেই আমরা মিষ্ট, কি কটু, কি কোন প্রকার আস্বাদন উপলব্ধি করিতে পারি না। মহত্তর উচ্চতর আধ্যাত্মিক বিষয়-সকলও আমাদের পক্ষে এই রূপ।

এই সহজ-জ্ঞান আর বুদ্ধি, এ দুয়ের স্বরূপ বিস্তর ভিন্ন। সহজ-জ্ঞানে আমরা বিষয় পাই, বুদ্ধি সেই সকল বিষয়, লইয়া নির্ম্মাণ করে। বিস্তৃতি আর সংখ্যার জ্ঞান আমরা সহজে উপলব্ধি করি, বুদ্ধি তাহা লইয়া গণিত শাস্ত্র নির্ম্মাণ করে; কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞান সহজে লাভ করি, বুদ্ধি তাহার উপরে নীতি-শাস্ত্র নির্ম্মণ করে। ঈশ্বর, পরকাল, সহজ-জ্ঞানে গ্রহণ করি, বুদ্ধি তাহাতে ধর্ম্ম-শাস্ত্র রচনা করে। এই সকল বিষয় না পাইলে বুদ্ধি কিসের উপর নির্মাণ করিবে। শুদ্ধ উপকরণ থাকিলেও একটী গৃহ নির্ম্মাণ হয় না; উপকরণ না থাকিলে কেবল নির্ম্মাতার বুদ্ধিতেও গৃহ নির্মাণ হইতে পারে না। জ্ঞান-নেত্রে আমরা শোভা দেখিতে পাই; বুদ্ধিতে শোভার প্রকার ও স্বরূপ ও তাহার তারতম্য এই সকল বিষয় বিবেচনা করি। ধর্ম্মের নিয়ম ও ব্যবস্থা—তাহার অনুষ্ঠানের ফল, এই সকল বিষয় লইয়া বুদ্ধি আলোচনা করে; কিন্তু ন্যায়, মঙ্গল, সত্য, এ সকলের আভা প্রথমে আমারদের অন্তদৃর্ষ্টিতেই পতিত হয়। ঈশ্বরের মহান্ ওরমণীয় ভাব-সকল প্রথমে আমরা সহজে উপলব্ধি করি, পরে তাহা বুদ্ধি দ্বারা বিশেষ করিয়া ব্যাখ্যা করি। এই দুই প্রকার করিয়া আমরা সকল জ্ঞান উপলব্ধি করিতেছি—সকল তত্ত্ব উদ্ঘট করিতেছি। প্রথমেই আমরা অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা সত্যকে দেখিতে পাই—পরে সেই সকল সত্যকে বিভাগ করা, শ্রেণীবদ্ধ করা তাহারদের মধ্যে প্রভেদ নির্দ্দেশ করা, এ সকল আমারদের বুদ্ধির কার্য্য।

অমারদের জ্ঞানের ভাব এই প্রকার করিয়া দিয়া ঈশ্বর কি উদার করুণা ও নিপুণ কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন। যদি বুদ্ধির বিকাশ না হইলে আমারদের

নিকটে প্রাণ হইতেও প্রয়োজনীয় সত্যসকল অপ্রকাশিত থাকিত; তবে যাহারা আপনাদের বুদ্ধি মার্জিত করিবার অবকাশই পায় না, তাহারদের কি দুর্দ্দশা হুইত। কিন্তু বস্তুতঃ হা নহে। জগদীশ্বর কতগুলি লোককে বাছিয়া কেবল তাহারদের উপরেই সকল করুণা বর্ষণ করেন নাই, কিন্তু তাঁহার অজস্র দান সকল পুত্রেরই জন্য। মূর্খ ও পণ্ডিত কৃষক ও শিল্পী, সকলেরই নিকটে আপনাকে প্রকাশ করিতেছেন। কুটীর-বাসী দীন ব্যক্তি তাহার পরিবারের মধ্যে থাকিয়া যেমন সুনির্ম্মল ধর্ম ও অকপট সত্যকে আশ্রয় করিতে পারে, জ্ঞানী ব্যক্তিও সেই প্রকার। এক সামান্য ব্যক্তি ঈশ্বরের মঙ্গল-স্বরূপে অটল নিষ্ঠা রাখিয়া রাশি রাশি বিপদের মধ্যে যেমন অনায়াসে চলিয়া যাইতে পারে, একজন বিদ্বান্ ধার্ম্মিকও সেই প্রকার। সকল মনুষ্যই এক পিতার পুত্র—মানব জাতিই এক শরীর। সকলের উপরে সকলের নির্ভর করিতেছে। এক ব্যক্তি, এক পরিবার, এক জাতি-ইহার কিছুই সমগ্র নহে। কিন্তু সকল মনুষ্যই এক জাতি—এক পরিবার। জ্ঞানের উন্নতি, মনের প্রাশস্ত্য, ধর্ম্মের বিস্তৃতি, এ সকল এক জন কি এক জাতির উপরে নির্ভর করিতেছে, এমত নহে; কিন্তু সকল মনুষ্য মিলিত হইয়া ঈশ্বরের এই সকল মহান্ উদ্দেশ্য সিদ্ধা করিতেছে।

এই স্বাভাবিক সাধারণ সহজ-জ্ঞানের উপরেই ব্রাহ্ম ধর্ম্ম স্থাপিত হইয়াছে, বালু-রাশির উপরে ইহার পত্তন হয় নাই। ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য-সকল আত্মপ্রত্যয়-সিদ্ধ; সেই সকল সত্যের আলোক মনুষ্যের অন্তর্দৃষ্টিতেই পতিত হয়। শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র উৎপত্তির পূর্ব্বে ও ব্রাহ্মধর্ম্ম ছিল; এবং এ সকল যদি একেবারে ধ্বংস হয়, তথাপি তাহা থাকিবে। বেদ, কোরাণ প্রভৃতি গ্রন্থ বিশেষে বা ঈসা মুসা প্রভৃতি ব্যক্তি বিশেষে ব্রাহ্মধর্ম্ম আবদ্ধ নহে। যে সকল সত্য বুদ্ধির হস্তে পতিত হইয়া বিকৃত হয় নাই, যে সকল সত্য গ্রন্থ মধ্যে নিহিত হইয়া বিবর্ণ হয় নাই, যে সকল সত্য এক মত কি এক সম্প্রদায় কি এক জাতির মধ্যে বদ্ধ নহে; তাহাই ব্রাহ্মধর্মের অন্তর্গত। সকল ধর্মের মধ্য হইতেই ব্রাহ্মধর্মের নৈসর্গিক সৌন্দর্য প্রকাশ পাইতেছে। যে ধর্ম্ম অস্থায়ী, সঙ্কীর্ণ, পরিবর্তসহ, তাহা ব্রাহ্মধর্ম্ম নহে; আর যাহা স্থায়ী, সাধারণ, অপরিবর্তনীয়, দেশ কালে অপরিচ্ছিন্ন; তাহাই ব্রাহ্মধর্ম। ব্রাহ্ম ধর্ম ইউরোপ কি ভারতবর্ষ কি বঙ্গ দেশের ধর্ম নহে, কিন্তু সকল দেশের উপরেই তাহার সমান অধিকার। ব্রাহ্মধর্ম অবস্থারও দাস নহে, ঘটনারও অধীন নহে; কিন্তু সকল কালেই তাহার সমান আধিপত্য।

এই বিশুদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্মের সহজ ভাব-সকল বুদ্ধির দ্বারা আলোচনা করিয়া কলিকাত ব্রহ্ম-বিদ্যালয়ে আমার পরম পূজনীয় পিতা মহাশয় যে সকল উপদেশ প্রদান করিয়া। ছেন, তাহা সাধারণের উপকারের জন্য গ্রন্থ-বদ্ধ করিয়া আমি প্রকাশ করিতেছি; ইহাতে যদি একটী আত্মাও ধর্মের সহায়ে উন্নতি লাভ করে এবং ঈশ্বর-ভাবে পূর্ণ হয়, তবে আমি কৃতার্থ হইব।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কলিকাতা।
৭ চৈত্র
১৭৮৩ শক।

পরিচ্ছেদসমূহ (মূল গ্রন্থে নেই)

সূচীপত্র

প্রথম উপদেশ
দ্বিতীয় উপদেশ
তৃতীয় উপদেশ
চতুর্থ উপদেশ
পঞ্চম উপদেশ
ষষ্ঠ উপদেশ
সপ্তম উপদেশ
অষ্টম উপদেশ
নবম উপদেশ
দশম উপদেশ

ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস।

প্রথম উপদেশ।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব এবং লক্ষণ।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে বাক্য ব্যয়ের কিছু মাত্র আবশ্যক করে না। বোধ-বিশিষ্ট ব্যক্তি মাত্রেই তাহা অঙ্গীকার করিয়া থাকেন। জগতের অস্তিত্বই তাঁহার অস্তিত্বের দেদীপ্যমান প্রমাণ। জগতে সকলই সুশৃঙ্খল সকলই কৌশলময়। ইহাতে কিছুই অসম্বদ্ধ বিশৃঙ্খল নহে। অনিচ্ছোৎপন্ন আকস্মিক ব্যাপার একটিও নাই। কোন পদার্থ— কোন নিয়মই নিরর্থক হয় নাই। এক সত্যকাম মঙ্গল সঙ্কল্প মহান্ পুরুষের ইচ্ছা এই বিশ্ব সংসারে দেদীপ্যমান: প্রকাশ পাইতেছে। ঈশ্বরের জনস্বরূপ ও মঙ্গল-ভাব। মনোমধ্যে ধারণ না করিয়া তাঁহার অস্তিত্ব মাত্র স্বীকার করলে কেবল শূন্য ঈশ্বর, এই মাত্র মুখে বলা হয়। তাঁহার অস্তিত্বের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার জ্ঞান এবং মঙ্গল-ভাবও এই জগতে সুব্যক্ত হইতেছে। সকল কৌশলে

তাঁহার জ্ঞান জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। সমস্ত ঘটনাতেই তাহার মঙ্গলভাব মুদ্রিত রহিয়াছে। মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ সকলে মিলিয়া তাঁহার জ্ঞান ও মঙ্গলাভিপ্রায়ের পরিচয় দিতেছে। তিনি আছেন, এই মাত্র বলিলে তাঁহার কিছুই বলা হয় না। তিনি আছেন, এবং তিনি জ্ঞান-স্বরূপ ও মঙ্গল-স্বরূপ। তাঁহার জ্ঞান ও মঙ্গল-ভাবের কি সীমা হয়? না, তিনি অনন্ত জ্ঞান—তিনি পূর্ণ মঙ্গল। জগতের কারণ ঈশ্বর আছেন, কিন্তু তাঁহার জ্ঞান নাই, এমন কথনই হয় না। জগতের কারণ জ্ঞানবান্ পুরুষ আছেন, কিন্তু তাঁহার মঙ্গল-ভাব নাই, ইহাও বলা যায় না। তিনি যে এই জগৎ সৃজন করিয়াছেন, তাহা অমঙ্গলের জন্য—তবে তিনি ঈশ্বর নহেন; কোন ভীষণ দৈত্য কিম্বা অসুর এই বিশ্বের রচয়িতা। ঈশ্বর আছেন তাহার সঙ্গে সঙ্গে এই দুইটা লক্ষণ স্পষ্ট রহিয়াছে যে তিনি জ্ঞান-স্বরূপ এবং মঙ্গলস্বরূপ। আমরা মনুষ্যের আকৃতি ও তাহার জ্ঞান ধর্ম্ম মনে না করিয়া মনুষ্যকে ভাবিলে, যেমন মনুষ্যের ভাব আমারদের মনে আইসে না, সেই রূপ ঈশ্বরের জ্ঞান এবং তাঁহার মঙ্গল-ভাব অবগত না হইলে ঈশ্বর শব্দের অর্থই বোধগম্য হয় না। তাঁহার জ্ঞান নাই, তবে তিনি জড়; তাঁহার মঙ্গল ভাব নাই, তবে তিনি নিষ্ঠুর অসুর বা নির্দয় দৈত্য। সমুদায় সৃষ্টি প্রক্রিয়াই তাঁহার জ্ঞান ও মঙ্গল সঙ্কল্প প্রচার করিতেছে। এমন নিয়ম নাই, যাহাতে তাঁহার দুর্ব্বিগাহ মঙ্গল অভিপ্রায় প্রকাশিত না রহিয়াছে। এমন কার্য্য নাই, যাহাতে তাঁহার অসীম জ্ঞান প্রকাশ না পাইতেছে। এই দুই লক্ষণ তাঁহার স্বরূপের প্রধান লক্ষণ। ঈশ্বরের স্বরূপ হইতে এই দুই লক্ষণ প্রত্যাহার করিয়া লইলে, তাঁহাতে ঈশ্বরের ভাব কিছুই থাকে না। তাঁহার অস্তিত্বের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার স্বরূপ লক্ষণ সর্ব্বত্রই সুব্যক্ত হইতেছে। সমুদয় জগৎ সংসারই কার্য্য, তাহার তিনি মূল কারণ। সমুদয় জগৎ শৃঙ্খলাই কৌশলময় এবং তিনিই সেই কৌশলের কারণ জ্ঞান-স্বরূপ পরব্রহ্ম। জগতের সমুদয় নিয়মই মঙ্গলাবহ এবং ইহার নিয়ন্তা মঙ্গল সঙ্কল্প।

কিন্তু ঈশ্বরের জ্ঞান ও মঙ্গল-ভাব পরিমিত কি অপরিমিত; তিনি কি কতক জানেন, কতক জানেন না—কতক দেশ দেখেন, কতক দেখেন না—তিনি বাহিরে আছেন, অন্তরে নাই; তাঁহার কতক সাধুভাব এবং কতক অসাধু ভাব? তিনি কি এই প্রকার অপূর্ণ? কখনই না। যে কিছু পরিমিত বস্তু, তাহাই সৃষ্ট বস্তু। যিনি জগদীশ্বর, তিনি অপরিমেয়— তিনি পরিপূর্ণ। এই সত্যটি সকলেরই বুদ্ধি ভূমিতে নিহিত আছে। ঈশ্বরকে অনন্ত অসীম অপরিমেয় না বলিলে তাঁহার কোন স্বরূপই বলা হয় না। ঈশ্বরের কোন বিষয়ের সীমা আছে—পরিমাণ আছে—তাঁহার কিছুরই খর্ব্বতা আছে, ইহা বলিলে তাঁহাকে ঈশ্বর বলা হয় না; অন্য কোন পরিমিত সৃষ্ট বস্তু বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়। ঈশ্বর যিনি, তিনি পূর্ণ। পূর্ণ যে কি তাহা সেই পূর্ণ-স্বরূপই জানেন; আমরা অপূর্ণ জীব হইয়া তাঁহার পূর্ণ ভাব মনে ধারণ করিতে পারি না। তবে তাঁহাকে অনন্ত অসীম অপরিমেয় বলাই আমারদের সাধ্য। তাঁহার যে কোন বিষয় মনে করি, সকলই অনন্ত। তিনি জ্ঞানেতে অনন্ত—তিনি

শক্তিতে অনন্ত—তিনি মঙ্গলভাবে অনন্ত—তিনি দেশেতে অনন্ত— তিনি কালেতে অনন্ত।

যখন তাঁহার জ্ঞানের সহিত অনন্ত ভাবকে মিলিত করি, তখন তাঁহাকে সৰ্ব্বজ্ঞ বলি। তিনি ভূত ভবিষৎ বর্তমান সকল কালের সকল ব্যাপার বিশেষ রূপে অবগত হইতেছেন। তিনি যেমন বাহিরের সমস্ত বিষয় জানিতেছেন, সেই প্রকার আমাদের অন্তরের প্রত্যেক কামনা ও প্রত্যেক ভাব সম্যক অবধারণ করিতেছেন। অন্ধকার তাঁহার নিকটে কোন কুকৰ্ম্মকে গোপন রাখিতে পারে না এবং কপটতাও তাঁহার জ্ঞান হইতে সত্যকে আচ্ছন্ন করিতে পারে না। তাঁহার অনন্ত জ্ঞানের গুরুভার পরিমাণ করিয়া শেষ করা যায়।

যখন তাঁহার মঙ্গলস্বরূপ এবং অনন্ত ভাব একত্র করি, তখন তাঁহাকে পূর্ণ-মঙ্গল বলি। মন্দের সঙ্গে তাঁহার লেশমাত্র সম্পর্ক নাই। কোন দোষ বা গ্লানি বা কলঙ্ক তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। আলোকের সীমা কি? না, অন্ধকার। জ্ঞানের সীমা কি? না, অজ্ঞান। সদ্ভাবের সীমা কি?, অসদ্ভাব। মঙ্গলের সীমা কি? না, অমঙ্গল ঈশ্বর কোন সীমা বিশিষ্ট পদার্থ নহে। মনুষ্যের বিষয়ে যখন আমরা এই প্রকার বলি যে এ ব্যক্তির এত গুলি গুণ আছে, তখনই ইহাও বলা হইল, যে তাহার এতটকু দোষও আছে। কিন্তু ঈশ্বরের মঙ্গল ভাবের সীমা করা যায় না। তাঁহার জ্ঞানের সীমা নাই বলিয়া তিনি সর্বজ্ঞ; তাঁহার মঙ্গলভাবের সীমা নাই বলিয়া তিনি পূর্ণ মঙ্গল।

যখন তাঁহার শক্তির বিষয় বিবেচনা করি, তখন তাঁহাকে অয়ন্ত শক্তি ও সৰ্ব্বশক্তিমান্ বলিয়া প্রত্যয় যাই। আমাদের অভিপ্রায়ও যদি মঙ্গল হয়, তবে শক্তির অভাবে হয় তো তাহা সম্পন্ন হয় না। কিন্তু তাঁহার সে প্রকার নয়। তাঁহার ইচ্ছা মঙ্গলময়ী এবং তাঁহার যাহা ইচ্ছ তাহাই হইতেছে এবং পরেও তাহাই হইবে। তাঁহার অপরিসীম শক্তির প্রভাবে সমুদয় পদার্থ নিজ নিজ শক্তি ধারণ করিয়াছে। এখানে যত জড় রাশি, যত প্রাণি জঙ্গম, উপরে যত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড লোক মণ্ডল, যত লোক-নিবাসী জীবপুঞ্জ, যত প্রকার সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্ম কৌশল সমূহ, তাহাতেই যে তাঁহার শক্তির পরিসমাপ্তি হইয়াছে, এমত নহে। তাঁহার শক্তির ক্রটি নাই। তিনি বিচিত্র শক্তি এবং তিনি সৰ্ব্বশক্তিমান্। তিনি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের এক মাত্র কারণ। তিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই করিতে পারেন।

আবার যখন তাঁহার অনন্ত ভাব কালের সঙ্গে সংযোগ করি, তখন তাঁহাকে নিত্য শব্দে ব্যক্ত করি। তিনি পূৰ্ব্বেও ছিলেন, অদ্যও আছেন, তিনি পরেও থাকিবেন। যখন কিছুই সৃষ্টি হয় নাই, তখনও তিনি ছিলেন এবং যদি সমুদয়ই বিনাশ পায়, তথাপি তিনি থাকিবেন। কাল সহকাৱে তাঁহার স্বরূপের পরিবর্ত্তন

নাই। তিনি ধ্রুব—তিনি অপরিবর্ত্তনীয়। তিনি সর্ব্বকালে সমভাবে স্থিতি করিতেছেন।

তিনি সর্ব্বব্যাপী—দেশেতে তাঁহার সীমা হয় না। তিনি কোন এক দেশে বসিয়া রাজত্ব করিতেছেন, এমত নহে। সমুদয় জগৎই তাঁহার আবাস স্থান, আমাদের আত্মাও তাঁহার আসন। তিনি অচিন্ত্য-দূরস্থিত নক্ষত্রেও আছেন, এবং সকল অপেক্ষা নিকটের বস্তু যে আমি, আমাতেও তিনি আছেন। তাঁহাকে পাইবার জন্য স্থান বিশেষ অন্বেষণ করিতে হয় না, এবং স্থান বিশেষ হইতে দূরে গেলেও তাঁহা হইতে দূরস্থ হওয়া যায় না।

তিনি নিয়ন্তা, নিয়ন্তা ব্যতীত নিয়ম হয় না, নিয়ম কথন কোন কার্য্যের স্বয়ং কর্ত্তা হইতে পারে না। নিয়ম বলিলেই তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাহার নিয়ন্তাকেও বলা হয়। ঈশ্বর এখানে কেবল উদাসীনের ন্যায় রহিয়াছেন, এমত নহে; তিনি সকলের নিয়ন্তা রূপে, সকলের যন্ত্রী রূপে বিদ্যমান আছেন। তাঁহার নিয়মের অধীনে থাকিয়া সকলেই তাঁহার আজ্ঞা পালন করিতেছে।

তিনি সর্ব্বাশ্রয়, তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া সকলে স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে। তিনি একাকী সকলেরই আধারভূত—আর সকলই তাঁহার আশ্রিত। পূর্ব্বে যখন ইহার কিছুই সৃষ্টি হয় নাই, তখনও তাহার সৃজন-শক্তি তাহাতেই অব্যক্ত রূপে নিহিত ছিল। এক্ষণে সেই শক্তি কার্য্যেতে পরিষ্ফুট হইয়া যাহা কিছু উৎপন্ন হইয়াছে, সে সকলই সেই শক্তিকে অবলম্বন করিয়া নিয়তই চলিতেছে। বৃক্ষ কখন মূল হইতে পৃথক্ থাকিতে পারে না। মা, জগৎ সংসারেও কখন জগৎ কর্ত্তা হইতে নিচ্ছিন্ন থাকিতে পারে না। তিনি লোক ভঙ্গ নিবারণের সেতু স্বরূপ হইয়াছেন। তাঁহার ইচ্ছার অসদ্ভাবে সমুদায়ই ধ্বংস হয়। তিনিই সমস্ত আধারের মূলাধার—তিনিই সকল শক্তির মূল শক্তি।

তিনি নিরবয়ব। তিনি জ্ঞান-স্বরূপ, সুতরাং তাঁহার কোন অবয়ব নাই। জড় বস্তুরই অবয়ব আছে। যাহা খণ্ড খণ্ড করা যায়—যাহার আকৃতি আছে—বিস্তৃতি আছে, তাহারই অবয়ব থাকা সম্ভব। সূর্য-কিরণে উদ্দীপ্ত অতি সূক্ষ্ম বালুকা রেণুও অবয়ব বিশিষ্ট। কিন্তু জ্ঞান পদার্থ নিরবয়ব। জড় বস্তু আকাশ অবলম্বন করিয়া আছে, কিন্তু জ্ঞান বস্তু সে রূপে নাই। আমাদের আত্মাও নিরবয়ব এবং পরমাত্মাও নিরবয়ব।

তিনি নির্ব্বিকার। তিনি পূর্ণ-মঙ্গল স্বরূপ ইহা বলতেই, তিনি নির্ব্বিকার ইহা বলা হইয়াছে। মনুষ্যের শরীরের বিকার যে রোগ, তাহাও তাঁহাতে নাই, মনুষ্যের মনের বিকার যে পাপ, তাহাও তাঁহাতে নাই। পাপই অমঙ্গল; অত এব মঙ্গল

স্বরূপেতে পাপ স্পর্শ করিতে পারে না। তিনি অকায় অব্রণ; তিনি পরিশুদ্ধ অপপ-বিদ্ধ।

তিনি একমাত্র অদ্বিতীয়। সমুদায় বিশ্বব্যাপার এক প্রকাণ্ড কৌশল যন্ত্রের অন্তর্গত। ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত সমুদায় পদার্থের মধ্যে এক অভেদ্য সম্বন্ধ নিবদ্ধ রহিয়াছে। যিনি জ্যোতির সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই নেত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন। যিনি ক্ষুধা তৃষ্ণা দিয়াছেন, তিনিই অন্নপান পরিবেশন করিতেছেন। সমুদায় সৃষ্টিই একটী কৌশল যন্ত্র এবং তিনি মাত্র তাহার একই যন্ত্রী—অপর কাহারও হস্ত তাহাতে নাই।

তিনি স্বতন্ত্র। তাঁহার কেহ নিয়ন্তা নাই, তিনি কাহরও অধীন নহেন। তিনি কাহারও সহায়তা গ্রহণ করিয়া সৃষ্টি করেন নাই; আমাদের সকলই তাঁহার সহায়তার অধীন। তিনি কাহারও মন্ত্রণা লইয়া জগৎ কার্য্য চালনা করিতেছেন, এমনও নহে। তিনি একাকী—তাঁহার যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই সম্পন্ন হয়। আমরা সকলে তাঁহার অধীনে থাকিয়া তাঁহারই অভিপ্রায় সম্পন্ন করিতেছি, কিন্তু তিনি একমাত্র স্বতন্ত্র।

তিনি পরিপূর্ণ। তাঁহার কিছুই খর্ব্বতা নাই। তাঁহার কোন তত্ত্বের অন্ত হয় না—সীমা হয় না—পরিমাণ হয় না। তিনি অনন্ত, অপরিসীম, অপরিমেয় পূর্ণ পদার্থ। কাহারও সহিত তাঁহার উপমা হয় না।

এই অনন্ত-জ্ঞান পূর্ণ মঙ্গল পুরুষের প্রতি স্থিরদৃষ্টি রাখিয়া আমরা যেন জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করি। যিনি সর্ব্বজ্ঞ, তিনি আমারদের অন্তর্যামী। তাঁহার নিকটে অন্ধকার ও আলোক উভয়ই তুল্য। নির্জনে পাপাচরণ করিলে, তাঁহার নিকট অপ্রকাশ থাকে না। আমরা তাঁহাকে অন্তস্থায়ী সর্ব্বসাক্ষী জ্ঞান করিয়া যেন তাঁহার প্রিয় কার্য্যসাধনে তৎপর থাকি। তিনি মঙ্গল স্বরূপ। তাঁহার শুভ অভিপ্রায় যাহাতে সম্পন্ন হয়, তাহার জন্য আমারদের প্রাণপণে যত্নবান থাকা উচিত। আমাদের ইচ্ছা যেন। তাঁহার মঙ্গলময়ী ইচ্ছার বিরোধিনী না হয়। তিনি আমাদিগকে এই শুভ উদ্দেশে এখানে প্রেরণ করিয়াছেন যে আমরা জ্ঞান ধর্ম্ম লাভ করিয়া তাঁহার সহবাসের উপযুক্ত হই। আমাদের ইচ্ছা ও চেষ্টা যদি সেই মহান উদ্দে- শের উপযোগিনী হয়, তবেই আমাদের মঙ্গল। তামরা ঈশ্বরের আদেশ পালন করিলে এবং তাহার প্রতি প্রেম ও অনুরাগ বদ্ধ করিলে, দুই মহংকার্য এক কালে সুসিদ্ধ হয়—তাহাতে ঈশ্বরের মঙ্গল অভিপ্রায় সম্পন্ন করা হয় এবং আমাদের আপনাদেরও অশেষ কল্যাণ সংসাধন করা হয়।

সত্যং শিবং সুন্দর।

অনন্ত, পরিপূর্ণ, অদ্বিতীয়, কাহারও সহিত
তঁহার উপমা হয় না।
অনন্ত জ্ঞান—অপরিমিত জ্ঞান, পূর্ণ-জ্ঞান, সর্ব্বজ্ঞ,
নিরবয়ব, একমাত্র।
অনন্ত মঙ্গল—অপরিমিত মঙ্গল-ভাব, পূর্ণ-মঙ্গল, নিষ্পাপ,
নির্বিকার, পবিত্র-স্বরূপ, নির্দোষ, সুন্দর,
আনন্দ-রূপ, প্রেম-স্বরূপ।
অনন্ত সক্তি—সর্বশক্তিমান, অপরিমিত শক্তি, সৃষ্টিস্থিতি
প্রলয়কর্ত্তা, স্বতন্ত্র, সাশ্রয়, সর্বনিয়ন্তা।
অনন্ত কালে—নিত্য, অনাদনন্ত, ধ্রুব, অপরিবর্তনীয়-
সবভাব।
অনন্তু দেশে—সর্ব্বব্যাপী, অপরিসীম।

***

দ্বিতীয় উপদেশ।

ঈশ্বর সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়কর্ত্তা।

পরমেশ্বরই সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের একমাত্র কারণ। সেই পূর্ণ পুরুষের ইচ্ছামাত্র সমুদায় জগৎ অসদবস্থা হইতে উদ্ভাবিত হইয়া সৎভাব প্রাপ্ত হইয়াছে, তাঁহার মহতী ইচ্ছার অধীনে ইহারা অদ্যাপি স্থিতি করিতেছে এবং সেই ইচ্ছার বিরাম হইলে সমুদায় পদার্থ স্বীয় স্বীয় শক্তির সহিত তাঁহার শক্তিতে লয় প্রাপ্ত হইয়া অন্তে তাঁহাতেই বিশ্রাম করিবে। পরমেশ্বর সর্বশক্তিমান্ এবং যিনি সর্ব্বশক্তিমান্, তিনিই সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় কর্ত্তা। সৃজন শক্তি, পালন শক্তি এবং সংহার শক্তি, এই তিন অলৌকিক শক্তি কেবল তাঁহারই। যিনি সৃষ্টি করিতে পারেন; তিনিই সংহার করিতে পারেন, যে নির্ম্মাণ করিতে পারে, সে ভঙ্গ করিতেও পারে। এক রেণু বালুকা আমরা সৃষ্টি করিতে পারি না, এক রেণু বালুকা ধ্বংস করিতেও পারি না। আমরা যেমন কতকগুলি উপকরণ একত্র করিয়া এবং সেই সকলকে উপযুক্ত মত সংযোগ করিয়া কোন যন্ত্র নির্ম্মাণ করি, জগদীশ্বর সে রূপে বিশ্ব নির্ম্মাণ করেন নাই। তাঁহার ইচ্ছাতেই এই সমুদয় উৎপন্ন হইয়াছে। তিনি স্বীয় মহীয়সী শক্তির প্রভাবে এই বিশ্বকে অসৎ অবস্থা হইতে সদ্ভাবে আনিয়াছেন। তাঁহার শক্তির কোন সহকারী কারণ নাই।

অসৎ হইতে সৎ, আপনাপনিই জন্মিতে পারে না। “কথমসতঃ সজ্জায়েত।” অনন্ত-শক্তিসম্পন্ন অনাদি পুরুষের ইচ্ছাই এই জগতের অস্তিত্বের মূলীভূত কারণ। আবার যাঁহার ইচ্ছাতে সৃষ্টি হইয়াছে, তাঁহার সেই ইচ্ছার বিরাম ব্যতীত সৃষ্টির কণামাত্রও ধ্বংস হইতে পারে না। ঈশ্বরের শক্তি ব্যক্ত হওয়ার নাম সৃষ্টি—ঈশ্বরের শক্তি ঈশ্বরেতেই প্রত্যাবৃত্ত হওয়ার নাম প্রলয়। যে অনাদি পুরুষের শক্তি হইতে এই সকল বস্তু উৎপন্ন হইয়া স্বীয় স্বীয় শক্তি লাভ করিয়াছে, তিনি যদি সেই মহীয়সী শক্তি অপনয়ন করিবার ইচ্ছা করেন, তবে স্বীয় স্বীয় শক্তির সহিত

সমুদয় সৃষ্ট বস্তু তাঁহার শক্তিতে লয় পাইয়া পুনর্ব্বার তাঁহাতেই গমন করিবে। সৃষ্টি হইবার পরে ঈশ্বরের যে শক্তি যাবতীয় সৃষ্টি প্রক্রিয়াতে আবির্ভূত হইয়াছে, সৃষ্টির পূর্ব্বে বস্তুতও সেই শক্তি ঈশ্বরেতে অব্যক্ত রূপে অবস্থিত ছিল এবং তিনি যদি ইচ্ছা করেন, তবে সেই শক্তির আবির্ভাব নিবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার শক্তি তাঁহাতেই পূর্ব্বের মত অব্যক্ত রূপে স্থিতি করিবে।

স্থিতি কালে সমুদায় লোক তাঁহারই মহতী ইচ্ছার অধীনে স্থিতি করিতেছে। চেতনাচেতন সমুদয় পদার্থই তাঁহার নিয়ম অবলম্বন করিয়া আছে, কেহই তাঁহার নিয়ম অতিক্রম করিতে পারে না। পরমেশ্বর জ্ঞানেতে অভ্রান্ত— তিনি শক্তিতে অনন্ত। তিনি প্রথমে যে সকল ভৌতিক শারীরিক ও মানসিক নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহা অখণ্ডনীয়, তাহা অপরিবর্ত্তনীয়। জীব মাত্রেই তাঁহার মঙ্গলময় নিয়মের অধীন—মনুষ্যও তাঁহার আশ্রয়ে থাকিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। তিনি অচেতন জড় পদার্থকে যে প্রকার নিয়মে নিয়মিত করিয়াছেন, প্রাণ বিশিষ্ট উদ্ভিদ্ বর্গকে তদ্ভিন্ন আর তার নিয়মে বদ্ধ করিয়াছেন। তিনি প্রাণ বিশিষ্ট বৃক্ষ বল্লবাদির মধ্যে যে সকল নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন, সচেতন জীব জন্তুদিগকে তদতিরিক্ত আরো অনেক প্রকার নিয়মের অধীন করিয়াছেন। আবার তিনি পশু পক্ষী কীট পতঙ্গের মধ্যে যে সমুদয় নিয়ম ব্যবস্থিত করিয়াছেন, মনুষ্যের জন্য শুদ্ধ সে রূপ করিয়া ক্ষান্ত হন নাই। জগদীশ্বর মনুষ্যকে স্বীয় প্রবৃত্তির উপর কর্ত্তৃত্ব, দিয়াছেন, তাহার একান্ত অধীন করিয়া দেন। নাই। এই প্রকার আধিপত্য ও কর্ত্তৃত্ব ভার পাইয়াছে বলিয়াই মনুষ্য নামের এত গৌরব হইয়াছে। চন্দ্র সূর্য্য মাধ্যাকর্ষণ শক্তি অতিক্রম করিয়া এক পদও প্রসারণ করিতে পারে না; পশু পক্ষী স্ব স্ব প্রবৃত্তির প্রতিকূলে আপন ইচ্ছাতে চলিতে পারে না; কিন্তু মনুষ্য আপনার প্রকৃতির উপরে কর্ত্তৃত্ব করিতে পারে। আপনার উৎকর্ষ এবং অপকর্ষ সাধন মনুষ্যের যত্নাধীন। মনুষ্য আপনার শুভাশুভ বিষয়ে আপনিই দায়ী। মনুষ্যই ধর্ম্ম রূপ মন্ত্রী পাইয়াছেন। তিনি ন্যায় অন্যায়, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা ফরিয়া কার্য্য করিতে পারেন। মনুষ্যেরই এমত শক্তি আছে, যে তিনি স্বীয় প্রবৃত্তির কুটিল অভিসন্ধি সুদূর পরাহত করিতে পারেন। তিনি সহস্র প্রকার বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ঈশ্বরের পথে পদ প্রসারণ করিতে পারেন। মানুষ্যের এই প্রকার কর্ত্তৃত্ব ভার রহিয়াছে বলিয়াই তিনি পাপের দণ্ড ভোগ করিতেছেন এবং পুণ্যের পুরস্কার লাভ করিতেছেন; কখন বা আত্ম-প্রসাদ লাভ করিয়া স্ফুর্ত্তি ও প্রভাযুক্ত হইতেছেন এবং কখনও বা আত্ম-গ্লানিতে বিষণ্ন ও বিশীর্ণ হইতেছেন। ঈশ্বরের কি আশ্চর্য্য মহিমা! কি অদ্ভুত শক্তি! পূর্ব্বে কিছুই ছিল না, আর তিনি আপন ইচ্ছাতেই আশা ভরশা বুদ্ধি জ্ঞান ধর্ম্ম প্রভৃতি আশ্চর্য্য শক্তি সম্পন্ন মনুষ্যের সৃজন করিলেন। মনুষ্য অসদ্ভাব হইতে তাঁহার ইচ্ছায় উদ্ভাবিত হইয়া সেই অনাদ্যনন্ত সৎস্বরূপকে পাইবার অধিকারী হইয়াছে। মনুষ্য পশুদিগের ন্যায় অশনায়া পিপাসা স্নেহ শোক বিশিষ্ট হইয়াও এক ধর্ম্মের প্রসাদে এমত মহত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। যাঁহার আশ্রয়ে

সমস্ত লোক এবং সমুদয় জীব স্থিতি করিতেছে, তাঁহারই আশ্রয়ে থাকিয়া মনুষ্যও জ্ঞান ধর্ম্ম উপার্জন করিতেছে এবং ধর্ম্মের শেষ পুরস্কারস্বরূপ যে তিনি, তাঁহাকে লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতেছে।

জগদীশ্বরের ইচ্ছাতে যেমন এই সমুদয় জগৎ স্থিতি করিতেছে; সেই রূপ তাঁহার যদি ইচ্ছা হয়, তবে তাহাদের কণামাত্রও থাকিতে পারে না। কিন্তু এই বলিয়া যে তিনি এই সুকৌশল-সম্পন্ন পরমাশ্চর্য্য বিশ্বযন্ত্র পুনর্ব্বার বিনষ্ট করিবেন, এমন সম্ভব হয় না। এই জগৎ সংসারের সমুদয় ব্যাপারই উন্নতির ব্যাপার। পৃথিবী প্রথমে যেরূপ তেজস্বিনী ছিল, এখন আরও সতেজ হইয়াছে। পৃথিবীর মুখশ্রী দিন দিন আরও প্রফুল্ল হইতেছে। ভূতত্ত্ববেত্তারা পৃথিবীর আদিম অবস্থা যে প্রকার নিরূপণ করিয়াছেন, তাহা হইতে পৃথিবী এক্ষণে কত উন্নতাবস্থায় উপনীত হইয়াছে। আবার যদি কেবল এক মনুষ্য জাতির অবস্থা পর্য্যালোচনা করা যায়, তাহা হইলেও ঈশ্বরের মঙ্গল অভিপ্রায় স্পষ্ট প্রতিভাত হয়। মনুষ্য-জাতির অবস্থা সবিশেষ উন্নতিশীল। তাহাদের মধ্যে জ্ঞানের উন্নতি হইতেছে, ধর্ম্মের উন্নতি হইতেছে এবং সামাজিক অবস্থারও উত্তরোত্তর উন্নতি হইয়া আসিতেছে। মনুষ্য জাতির মধ্যে যেমন পৃথিবীতে উন্নতির আলোক প্রকাশ পাইতেছে; সেই প্রকার প্রতি মনুষ্য অনন্ত কালের মধ্যে যে কত উন্নত হইবে, তাহা কে বলিতে পারে? ঈশ্বর আমাদিগকে তাঁহাকে পাইবার এবং অনন্ত অখণ্ড নির্মলানন্দ লাভ করিবার প্রখর আশা দিয়াছেন; সেই সত্য পুরুষ আমারদিগকে এই প্রত্যাশা দিয়া কখন তাহা হইতে নিরাশ করিবেন না। যিনি একটি ক্ষুদ্র তৃণও নিরর্থক করেন নাই, যিনি ক্ষুধা দিয়া অন্নের সৃষ্টি করিয়াছেন এবং পিপাসা দিয়া জল পরিবেশন করিতেছেন, তিনি এমন মহতী আশা কখনও নিরর্থক দেন নাই। তিনি এই স্পৃহাকে এখনই তৃপ্ত করিতেছেন এবং অনন্তকাল পর্যন্তও তৃপ্ত করিতে থাকিবেন। তিনি মঙ্গল সঙ্কল্প এবং তাঁহার বিশ্বরাজ্য কেবলই উন্নতির ব্যাপার। কিন্তু তিনি যদি এই বিশ্বসংসারকে সংহার করিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহার সেই ইচ্ছাকে কে খণ্ডন করিতে পারে? তিনি সেতু-স্বরূপ হইয়া এই লোক সকলকে ধারণ না করিলে, তাহাদিগকে আর কে রক্ষা করিতে পারে? "স সেতুর্ব্বিধৃতিরেষাং লোকানাম্ অসম্ভেদায়।"

তৃতীয় উপদেশ।

পরমেশ্বর আনন্দস্বরূপ।

পরমেশ্বর আনন্দ স্বরূপ। যে সকল পবিত্র-চিত্ত মহাত্মার পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া সুমহান্ আনন্দ লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাকে আনন্দ-স্বরূপ বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। পরমেশ্বর নির্ব্বিশেষ; তাঁহার কোন বিশেষ নাম নাই। সেই বিশ্বব্যাপী পরমাত্মাকে না চক্ষু দ্বারা দর্শন করা যায়; না হস্ত দ্বারা গ্রহণ করা যাইতে পারে। যখন তাঁহার নিষ্কলঙ্ক পবিত্র স্বরূপ—যখন তাঁহার সুমধুর মঙ্গল ভাব আমাদের বিশুদ্ধ বুদ্ধিতে প্রতিভাত হয়; যখন তাঁহার সন্নিকর্ষ আত্মার নিকটে উজ্জ্বল রূপে প্রকাশ পায়; তখন যে এক অনুপম স্বর্গীয় আনন্দ উপস্থিত হয়, তাহাতেই তাঁহার নিগূঢ় সত্তা উপলব্ধি হয়। মনের সঙ্গে বিষয়ের যেমন এক প্রকার সম্বন্ধ—পরমাত্মার সহিত আত্মারও সেই রূপ অতি নৈকট্য সম্বন্ধ রহিয়াছে। প্রিয় রস আস্বাদনে বা প্রিয় স্বর শ্রবণে মনেতে যেমন এক প্রকার সুখের সঞ্চার হয়; সেই রূপ ঈশ্বরের বিশুদ্ধ ভাব অনুভূত হইলে, আত্মাতে এক পবিত্র আনন্দরসের সঞ্চার হইয়া থাকে। বিষয়ের সংস্পর্শে মনেরই সুখ লাভ হয়, তাহাতে আত্মার পরিতোষ হয় না। আত্মার যে আনন্দ, সেই মঙ্গলস্বরূপের আবির্ভাবই তাহার কারণ। সেই আনন্দ-স্বরূপের প্রসন্ন মূর্ত্তিই সে আনন্দের জননী। এই ভূমানন্দের সঙ্গে সঙ্গে সেই মহান্ পুরুষের নিকট সম্বন্ধ অনুভূত হয় এবং তাঁহাকে প্রত্যক্ষবৎ প্রতীতি করা হয়। কিন্তু এই উজ্জ্বল পবিত্র ব্রহ্মানন্দ যে কি আনন্দ তাহা প্রতি জনের পরীক্ষার কথা; স্বীয় স্বীয় আত্মাতে ইহার পরীক্ষা ব্যতীত কাহারও বোধগম্য হইবার সম্ভাবনা নাই। ব্রহ্মানন্দ যে কি মহান্ আনন্দ, তাহা বাক্যেতেও ব্যক্ত হয় না এবং উপদেশ দ্বারাও বুঝান যায় না। কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে যাহারা মনুষ্য জন্ম ধারণ করিয়াছে, তাহারা সকলেই সমান রূপে সেই আনন্দ-রস পানে অধিকারী। ঈশ্বর সকলেরই সাধারণ সমৃদ্ধি এবং তিনি প্রত্যেকেরই নিজস্ব ধন। সকল অবস্থার লোকেই জগৎ-পিতার নিকট গমন করিতে পারে এবং সকল অবস্থার লোকেই তাঁহার পবিত্র সহবাস লাভে অধিকারী। আত্মস্পৃহারূপ স্বর্গীয় অগ্নি প্রচ্ছন্ন ভাবে বা প্রজ্জ্বলিত রূপে সকলেতেই আছে। কিন্তু এমন আশ্চর্য্য

অগ্নির উদ্দীপন হয় না বলিয়া এক্ষণে উহা নির্ব্বাণপ্রায় হইয়া যাইতেছে। ঈশ্বরের এক অমূল্য অতুল্য দান আমরা তুচ্ছ করিতেছি। উর্দ্ধবাহুর হস্তের ন্যায় আমাদের আত্মাও অসাড় হইয়া যাইতেছে। এ দেশের এক্ষণে যে প্রকার অবস্থা হইয়াছে, তাহাতে যে ঈশ্বরের ভাব কিছুমাত্র পরিস্ফুট হয়, ইহাই আশ্চর্য্য। বাল্যকালে কেবল অপরা বিদ্যার শিক্ষাতেই মন এমনি অহরহঃ নিমগ্ন থাকে, যৌবন কালে বিষয় চেষ্টাতেই এমনি বিব্রত থাকিতে হয়, বৃদ্ধ বয়সে অনর্থ চিন্তাতেই কাল এমনি গত হয়, যে ঈশ্বরতত্ত্ব সমালোচনা করিবার অবকাশও থাকে না—স্পৃহাও হয় না। ইহাতেও যে তিনি কখন কখন আমাদের আত্মাতে তাঁহার মহান্ ভাবের উদ্দীপন করেন, ইহা কেবুল তাঁহারই অসামান্য করুণার নিদর্শন। যদিও আমরা বিষয় চিন্তা হইতে নিশ্চিন্ত হইয়া ঈশ্বরে চিত্তার্পণ করিবার সময় পাই না, যদিও আমরা বিক্ষিপ্তচিত্ত হইয়া ঈশ্বর হইতে সততই দূরে ভ্রমণ করি, তথাপি যে তিনি এক এক বার আমাদের নিকটে আপনাকে প্রকাশ করিয়া বিমলানন্দ বিধান করেন, ইহাতে কেবল তাঁহার স্নেহ-দৃষ্টি ও প্রীতি দৃষ্টি প্রকাশ পাইতে থাকে। যদিও সেই পবিত্র আনন্দ তড়িতের ন্যায় চঞ্চল হয়—যদিও তাহা নিমেষের সমান তিরোহিত হয়, কিন্তু তাহাতেই বা কি? সেই যে চকিতের ন্যায় আনন্দ তাহার সহিত কোন প্রকার বিষয়ানন্দই সমযোগ্য হয় না।

এই ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিবার যাঁহাদিগের অভিলাষ হয়, তাঁহাদের কি রূপ আচরণ করা আবশ্যক? আপনাকে পবিত্র করা পবিত্রস্বরূপের সহবাস জনিত আনন্দ লাভ। করিবার প্রথম পথ। পাপ হইতে বিরত থাকা অপাপবিদ্ধ পরম পুরুষের প্রসন্নতা লাভের একমাত্র উপায়। যেমন শরীরের বিকার রোগ, সেই রূপ মনের বিকার পাপ। আত্ম-প্রসাদই মনের সুস্থতা, আত্ম-গ্লানিই মনের বিকৃতাবস্থা। শরীর সুস্থ না থাকিলে যেমন মন সুস্থ থাকে না, সেই রূপ মন প্রকৃতিস্থ না থাকিলে আত্মাও সুস্থতা লাভ করিতে পারে না। আমাদের আত্মা যদি অসুস্থ ও মলিন রহিল, তবে যিনি আমাদের আশার শেষ স্থল, প্রীতির পরমাস্পদ, তৃপ্তির একই তুমি, তাঁহাকে লাভ করিয়া আমরা সেই পরিশুদ্ধ আনন্দের আস্বাদ কি প্রকারে পাইতে পারি? তাহাতে সে আনন্দ উপভোগের প্রার্থনাও জন্মে না। পাপী ও পুণ্যাত্মা পরস্পর এত ভিন্ন, যেমন রোগী ও সুস্থ পুরুষ। বিকারী রোগী যেমন ক্রমিক জল পান করিয়াও পরিতোষ পায় না, সেই রূপ পাপী ব্যক্তি সম্ভোগসলিলে অনবরত বিলাস করিয়াও পরিতৃপ্ত হয় না। পাপেতে যতই লিপ্ত থাকা যায়, পাপ আপন অনুচরকে ততই আকর্যণ করিতে থাকে। পাপের সহিত বিশেষ রূপে প্রণয় বন্ধন হইলে, আর তাহার মলিনত্ব দেখা যায় না। পাপপঙ্কে নিমগ্ন থাকাই এখানকার নরক ভোগ। পাপীদিগের নিকটে ঈশ্বর উগ্র মূর্ত্তি ধারণ করেন—পাপীর পক্ষে তিনি মহদ্ভয়ং বজমুদ্যতং— ঈশ্বরের অপরাধী অসৎ সন্তান তাঁহার প্রেরিত দণ্ড ভোগ করিয়া তাঁহার পিতৃস্নেহ উপলব্ধি করিতে পারে না। কিন্তু তাঁহার দণ্ড স্নেহ সমন্বিত। তিনি আমাদিগকে আপন ক্রোড়ে আকর্ষণ করিবার

জন্যই দণ্ড বিধান করেন। পাপের উপযুক্ত দণ্ড পাইয়া আমরা পাপ হইতে বিরত থাকি—ক্ষীণপাপ হইয়া তাঁহার পবিত্র সহবাসের প্রার্থনা করি এবং তাঁহাকে লাভ করিয়া নির্ম্মলানন্দ উপভোগ করি, ইহাই তাঁহার অভিপ্রায়।

ঈশ্বরকে একবার লাভ করিতে পারিলে তাঁহাকে রক্ষা করিবার আকিঞ্চন সর্ব্বদাই জাগ্রৎ থাকে। কিন্তু সেই অমূল্য ধন রক্ষা করিবার উপায় কি? মনকে সুস্থ এবং, আত্মাকে সুস্থ রাখাই তাহার উপায়। সুনিশ্চল ধর্ম্মানুষ্ঠানে আপনাকে পবিত্র রাখাই তাহার উপায়। মধুস্বরূপ ধর্ম্ম যে কেবল পৃথিবীতে কল্যাণ উৎপাদন করেন, এমত নহে; ঈশ্বরের সন্নিধান প্রাপ্ত হইবার জন্যও ধর্ম্ম আমাদের সহায়। ধর্ম্মই ব্রহ্মধামের সোপানস্বরূপ। ধর্ম্মকে রক্ষা করিলে ধর্ম্ম আমাদিগকে ইহকালে রক্ষা করেন এবং আমাদের যথার্থ ধামে লইয়া যান। আমরা পাপ হইতে যত দূরে থাকি, পুণ্যের যত অনুষ্ঠান করি, ঈশ্বরস্পহার ততই উদ্দীপন হয়। ঈশ্বর যখন সেই মহতী স্পৃহাকে তৃপ্ত করেন, যখন তিনি তাঁহার সন্তাপ-হারিণী মূর্ত্তি প্রকাশ করেন, তখনই আমরা ভূমানন্দ লাভ করিয়া কৃতার্থ হই; তখনই আমরা জীবনের পূর্ণ সুখ ভোগ করি। সেই আনন্দ যে কেবল মুহুর্ত্ত কালের নিমিত্ত, তাহা নহে—সে আনন্দের যে একই প্রকার ভাব, তাহাও নহে। সেই আনন্দের ক্রমিকই উৎকর্ষ সাধন হইতে থাকে। স্বর্গ হইতে স্বর্গ লাভ; সুখ হইতে কল্যাণকর সুখের আস্বাদ গ্রহণ হইতে থাকে। মনুষ্যের সকল বিষয়েই হয় উন্নতি, নয় দুর্গতি। মনুষ্যের জ্ঞান ক্রমিক উন্নত হয়,—মনুষ্যের ধর্ম্ম ক্রমশঃ সবল হয়—মনুষ্যের মঙ্গল ভাব ক্রমে প্রশস্ত হইতে থাকে। আত্মারও উন্নতি হইতেছে। ঈশ্বরের সহিত আত্মার ক্রমিক নিকট সম্বন্ধ হইতে থাকে। ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী হওয়াই আত্মার প্রখর আশা। সেই সত্য পুরুষ এই মহতী আশাকে এখানেই পূর্ণ করিতেছেন। আত্মার সুস্থাবস্থাতে তাহার স্ফুর্ত্তি ও প্রভা দিন দিন বিবৃদ্ধ হয়। প্রতি সূর্য্যের উদয়ান্তের সঙ্গে সঙ্গে মেদিনীও যেমন নূতন নূতন বেশ ধারণ করে, আত্মাও সেই রূপ নূতন নূতন ভাবে বিরাজ করিতে থাকে। মন ও আত্মা যতই পবিত্র হয় ব্রহ্মানন্দ ততই দীপ্তি পায়। এখানে থাকিয়া ঈশ্বরের সঙ্গে যে সম্বন্ধ নিবদ্ধ করা হয়, অনন্ত কালেও তাহা ত্রুটিত হইবার নহে যিনি এক বার আপনাকে উজ্জ্বল রূপে প্রকাশ করিয়াছেন, তিনি আমাদের জ্ঞাননেত্র হইতে আর কখনই অন্তরিত হইবেন না। এই আমাদের স্পৃহা এই আমাদের আশা। চন্দ্র যদিও মলিন হয়—সূর্য্য যদিও নিস্তেজ হয়—নক্ষত্রসকল যদিও নির্ব্বাণ হয়, তথাপি আমাদের আত্মার কখন বিনাশ হইবে না। ঈশ্বর আমাদিগকে তাঁহাকে পাইবার প্রখর আশা দিয়া কদাপি নিরাশ করিবেন না।

পাপের সহিত লিপ্ত থাকিলে একে এখানে যন্ত্রণা, তাহাতে আবার ঈশ্বর হইতে বিচ্যুতি। আমরা যেন পাপ হইতে সর্ব্বদাই নিবৃত্ত থাকি; পাপকে বিষবৎ পরিত্যাগ করি; পাপচিন্তা, পাপালপ, পাপানুষ্ঠান, এই তিন প্রকার পাপ হইতে যেন প্রাণপণে দূরে থাকি। যদিও কখন পাপ-প্রলোভনে আকৃষ্ট অথবা মুগ্ধ হই, তবে

ঈশ্বরের নিকটে অকৃত্রিম অনুশোচনা করিয়া যেন তাহা হইতে বিরত হই। অনুতাপ—অকৃত্রিম অনুতাপই পাপের প্রায়শ্চিত্ত।

ঈশ্বর কেবল ন্যায়বান্ রাজা নছেন, তিনি আমাদের করুণময় পিতা, আমাদের মঙ্গল সাধনই তাঁহার উদ্দেশ্য। আমরা অতি ক্ষীণস্বভাব; আমাদের এক বারও ধর্মপথ হইতে পদ স্খলিত হইবে না, এমন কথনই সম্ভব হয় না। আমরা যদি এক বার পতিত হইয়া সেই পতিত-পাবনের প্রসাদ হইতে এক কালে বঞ্চিত হই, তবে আমাদের উপায় কি—তবে আমাদের নিস্তার কোথায়! যখন পিতার নিকটে ক্রন্দন করিলে তিনি প্রসন্ন হইয়া আমাদের অপরাধ মার্জ্জনা করেন, যখন সাধু ব্যক্তির নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিলে তিনি প্রশস্ত চিত্তে ক্ষমা বিতরণ করেন; তখন যিনি আমাদের পরম পিতা—যিনি পূর্ণ-মঙ্গল ও করুণাময় পাতা, তিনি কি অনুতাপিত হৃদয়কে কখনই শীতল করিবেন না। তিনি কি তাহার পতিত সন্তানের অকৃত্রিম ভাব দেখিলে ক্ষমা বিতরণে বিরত হইবেন? কখনই না। পরমেশ্বর যেমন রোগ শান্তির জন্য ঔষধের সৃজন করিয়াছেন, সেই প্রকার পাপের প্রতীকারের জন্য বিবিধ উপায় করিয়া দিয়াছেন। রোগী ব্যক্তি রোগ হইতে মুক্ত হইলেই যেমন আপনা আপনি জানিতে পারে, পাপীর ভাবও সেই প্রকার। যখন মন পাপেতে আসক্ত ও পতিত হয়, তখন তাহা আপনিই বুঝা যায় এবং যখন সে সেই পাপ হইতে পরিত্রাণ পায়, তখনও সহজে বুঝা যায় এবং তাহা বুঝিবার জন্য অন্যের সহিত মন্ত্রণা আবশ্যক হয় না। আত্ম-গ্লানি মনের রোগের লক্ষণ—আত্ম—প্রসাদই তাহার সুস্থতার লক্ষণ।

মনুষ্য অপূর্ণ বস্তু —অতি ক্ষুদ্র জীব। মনুষ্য এক বারেই নিষ্পাপ হইবে, এমন কখনই সম্ভব হয় না। ঈশ্বরই এক মাত্র শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ। কিন্তু ঈশ্বর মনুষ্যকে যে প্রকার বল দিয়াছেন, যে প্রকার কর্ত্তৃত্ব ভার দিয়াছেন, তাহাতে তাহার কিছুরই অনির্ব্বৃতি নাই। যাহাতে ধর্ম্মের পথে মনুষ্য উন্নতমস্তক থাকিতে পারে, তিনি তাহাকে এমত অতুল শক্তি দিয়াছেন। যাহাতে সে আপন প্রবৃত্তি ও অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিয়া পুণ্যপদবীতে আরোহণ করিতে পারে, তিনি তাহাকে এমত অতুল শক্তি প্রদান করিয়াছেন। যাহাতে পশুভাব মনুষ্যের উপরে প্রভুত্ব না পায়—যাহাতে তাহার মহদ্ভাব সকল উন্নত ও স্ফূর্ত্তি যুক্ত হয়, তিনি এ প্রকার নানা উপায় বিধান করিয়াছেন। আবার তিনি মধুস্বরূপ ধর্ম্ম দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তিনি আপনাকে আমাদের নিকটে প্রকাশ রাখিয়া আমাদের আত্মাকে সহস্রগুণ বলে সবল করিয়াছেন। পাপ হইতে মুক্ত হইলে ঈশ্বরের পবিত্র সহবাস উপার্জন করা যায়, আবার ঈশ্বরের সহবাস লাভ করিলে আত্মা পবিত্র হয় এবং পাপের আসক্তিও তেমনি ক্ষীণ হইতে থাকে। পাপ। হইতে মুক্ত হওয়া প্রথমে আমাদের যত্নাধীন, পরে আমরা ঈশ্বরের প্রসাদ ও আশ্রয় পাইলে পাপ আরো দূরে পলায়ন করে। কিন্তু একে আমরা দুর্ব্বল, তাহাতে আবার অন্তরের কত শত্রু এবং বাহিরের

কত শত্রু আমাদিগকে আক্রমণ করিতেছে, কায়মনোবাক্যে চেষ্টা ব্যতীত মনের পবিত্রতা ও আত্মার পবিত্রতা সম্পাদন করিতে কখনই সমর্থ হই না। যাহাদের ধর্ম্ম সরল আছে, ঈশ্বরস্পৃহা প্রবল আছে এবং আত্মা প্রকৃতিস্থ আছে, তাহারাও যখন মধ্যে মধ্যে ঈশ্বরের পথ হইতে স্খলিতপদ হয়; তথন তাহাদের কি দুর্দ্দশা, যাহারা স্বীয় কুপ্রবৃত্তির হস্তে আপনাকে অর্পণ করিয়া সংসার অরণ্যে বিচরণ করিতেছে। তাহাদের চিত্তভুজঙ্গ নিরন্তর কুটিলগামী হইয়া আপনার ও জন-সমাজের কত অনর্থই উৎপাদন করিতে থাকে।

ধর্ম্ম-রত্ন লাভ করিবার আন্তরিক ইচ্ছা চাই। আন্তরিক ইচ্ছা থাকিলে দুর্ব্বলতার অনেক পরিহার হয়। আমাদের অসৎ ইচ্ছা এক, আর দুর্ব্বলতা এক, দুই পৃথক্ বিষয়। যাহাদের সাধু ইচ্ছা, সাধু ব্যবহার, তাহাদের দুর্ব্বলতা জনিত পতন এক প্রকার; আর যাহাদের লোক রক্ষাই সর্ব্বস্ব এবং কপট ব্যবহারই পৃথিবীতে চলিবার উপায়, তাহাদের পাপ-প্রকাশ-জনিত পতন অন্য প্রকার। সাধু ব্যক্তি এক বার পতিত হইলে ঈশ্বরের প্রসাদে আবার উদ্ধার হইয়া আত্ম-প্রসাদ লাভ করেন। তাঁহার পাপজনিত অনুশোচনা এবং অনুশোচনা-জনিত ঈশ্বরের প্রকাশ, এই উভয় প্রকারেই তিনি পাপ হইতে মুক্ত হয়েন। পাপ হইতে মুক্ত হইলে ঈশ্বরের সহিত সহবাসের প্রার্থনা জন্মে, সেই প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গে আত্মস্পৃহা সমধিক উজ্জ্বল হয় এবং তৎপরে ঈশ্বর স্বীয় সন্তাপহারিণী মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া সকল সন্তাপ হরণ করেন। ঈশ্বরস্পৃহা সঞ্চারের পূর্ব্বে এই উপদেশ; পাপের সহিত যেন সংস্পর্শ না হয়। ঈশ্বর-স্পৃহার উদ্দীপন হইলে এই উপদেশ; পা পর সহিত যেন সংস্পর্শ না হয় এবং ঈশ্বরের প্রকাশ কালেও এই উপদেশ; পাপের সহিত যেন সংস্পর্শ না হয়। এই প্রকার পাপ হইতে দূরে থাকিবার যাহার আন্তরিক ইচ্ছা, ঈশ্বর তাহার সহায়। ঈশ্বরই দুর্ব্বলের বল—ঈশ্বরই পাপীর পরিত্রাতা।

চতুর্থ উপদেশ।

ঈশ্বর সত্য-স্বরূপ।

সত্য কাহাকে বলে? সত্যের প্রতিরূপ বস্তু কোথায়? কোন্ বিষয় এমন আছে যাহাকে সত্য বলা যাইতে পারে? সত্য কি বস্তু ও সত্যের স্বরূপ ও লক্ষণ কি? এই অনুসন্ধানে মনোনিবেশ করিলে প্রতীতি হইবে যে ঈশ্বর যিনি তিনিই সত্য, এবং সত্যই ঈশ্বর।

ঈশ্বর হইতে সত্য ভিন্ন নহে, এবং সত্য হইতে ঈশ্বর ভিন্ন নহেন। ঈশ্বরেতেই সত্য শব্দ সম্পূর্ণ সংলগ্ন হয়। তিনি ভিন্ন আর কিছুতেই হয় না। জড় বস্তুকে কি সত্য বলা যাইতে পারে? যখন দেখি জড় বস্তুর চেতন নাই। জড় বস্তু মৃত বস্তু; জড় বস্তু আপনাকে আপনি জানে না। তখন তাহাকে সত্যের যোগ্য বস্তু বলিয়া বোধ হয় না। সত্যের যে ভাব, তাহার সঙ্গে চেতন-শূন্য মৃত বস্তুর মিল হয় না। আমরা জীবিত মনুষ্যকে যে প্রকার সত্য মনে করি, তাহার মৃত শরীরকেও কি সেই প্রকার জ্ঞান করিয়া থাকি? এই যে সন্মুখে অচল অটল স্তব্ধ মৃতুর রূপ প্রাচীর দেখা যাইতেছে, ইহা কি সত্য? না আমি যে প্রাচীরকে দেখিতেছি, সেই সত্য পদার্থ? জড় যদি সত্য না হয়, তবে কি আমাদের জীবাত্মাই সত্য? জড় হইতে জীবাত্মা সত্য, কেন না জীবাত্মার জ্ঞান আছে, চেতন আছে। কিন্তু জীবাত্মার জ্ঞানও আছে, অজ্ঞানও আছে—জীবাত্মা কতক দেখিতেছে, কতক দেখিতে পায় না—জীবাত্মা কখন জাগ্রৎ, কখন নিদ্রিত -জীবাত্মা এক সময়ে ছিল না এবং যে পূর্ণ-পুরুষের আশ্রয়ে থাকিয়া জীবিত রহিয়াছে, তাঁহার ইচ্ছা হইলে পরেও থাকিবেক না। জীবাত্মার সকল বিষয়েরই সীমা আছে,পরিমাণ আছে। এই প্রকার সীমাবিশিষ্ট পরিমিত বস্তু যে আমাদের জীবাত্মা, তাহাকে যদি সত্য বলা যাইতে পারে, তবে পূর্ণ জ্ঞান ঈশ্বর কেমন সত্য! যিনি সর্ব্বজ্ঞ—যিনি আন্তর্যামী—যিনি ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সকল কালের প্রতিই সমান রূপ দৃষ্টি করিতেছেন; সেই সত্য পুরুষের তুলনায় আমারদের এই জীবাত্মাকেও সত্য বসিয়া বোধ হয় না। ঈশ্বর যিনি তিনিই সত্য—সত্য যিনি তিনিই ঈশ্বর।

কিন্তু সত্য বস্তু—জ্ঞান বস্তু, প্রাণবিশিষ্ট কি প্রাণশূন্য, জীবিত কি মৃত? পূর্ণ-জ্ঞান-স্বরূপের জ্ঞানই প্রাণ। তিনি সত্যস্বরূপ- তিনি পূর্ণ-জ্ঞান; অথচ তিনি প্রাণ-শূন্য মৃত বস্তু; এ দুই পরস্পর বিরুদ্ধ বাক্য। যিনি সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, তাঁহার প্রাণ জগতের প্রাণ। তিনি জীবিত বস্তু—মৃত বস্তু নহেন। তাঁহার জীবন এক সময় আরম্ভও হয় নাই, তাঁহার জীবনের কখন শেষও হইবেক না, তিনি অমৃত। তাঁহার প্রাণের হ্রাস নাই, বৃদ্ধি নাই; ব্যয় নাই, ক্ষয় নাই—তিনি অমৃত। তিনি জ্ঞানস্বরূপ, চেতনাবান্, স্বপ্রকাশ। তিনি মৃত্যুর বিপরীত বস্তু—তিনি প্রাণ।

সত্য যে বস্তু, তাহা কি কিছুকাল স্থায়ী, কি অনন্তকাল স্থায়ী? অন্তবৎ বস্তু আর অনন্ত বস্তু, ইহার মধ্যে কাহাকে সত্য বলা যায়? আমরা ঐন্দ্রজালিক ব্যাপারে যে সকল অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করি, তাহাকে মিথ্যা কেন বলি। তাহার এক প্রধান হেতু এই যে তাহা অতি অল্প কাল স্থায়ী। অন্তবৎ বস্তুর সঙ্গে সত্য ভাবের সম্পূর্ণ মিলন হয় না। আমরা চতুর্দ্দিকে যে সমস্ত বস্তু বিরাজমান দেখিতেছি, সে সকল যদিও সৃষ্টিকাল হইতে বর্ত্তমান রহিয়াছে; তথাপি সৃষ্টির পূর্ব্বে তাহার কিছুই ছিল না এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা হইলে পরেও থাকিবেক না; এই জন্য এ সমুদয়কে ঠিক সত্য বলা যায় না। যিনি অনন্ত—যিনি নিত্য—যিনি দেশ কালের অতীত পদার্থ— যিনি পূর্ব্বেও ছিলেন, অদ্যও আছেন, পরেও থাকিবেন; তিনিই সত্য। সত্যের ভাব কেবল সেই অনন্ত স্বরূপেতেই আছে। জড় বস্তু আদ্যন্তবৎ, আমাদের জীবাত্মাও আদ্যন্তবৎ, এই জন্য ইহারা তেমন সত্য নহে।

যাহা কিছু সত্য বলা যায়, তাহা নার সঙ্গে যোগ থাকিলে হইবেক না। এত কাল আছে, এত কাল নাই— সত্যের স্বরূপ এ প্রকার নয়। এতটুকু দেশে আছে, এত টুকু দেশে নাই—এ প্রকার বস্তু সত্য নহে। কতক জ্ঞান, কতক অন—কতক সদ্ভাব কতক অসদ্ভাব—কতক শক্তি কতক ক্রটি; এপ্রকার জ্ঞান-বস্তুও সত্য নহে। অভাববিশিষ্ট পদার্থ প্রয়োগ হইলে সৎ শব্দের অর্থই হয় না। পূর্ণ বস্তুই সত্য। এই হেতু ঈশ্বর ভিন্ন সত্যের সঙ্গে আর কোন বস্তুরই মিল পাওয়া যায় না। কতক আছে, কতক নাই—আছে আর নাই—এই দুই একত্র হইলে, সকল বস্তু সীমাবদ্ধ হয়। এ বস্তু এক সময় আছে, এক সময় ছিল না; ইহা বলিলেই তাহার কালেতে সীমা হইল। এ ব্যক্তির কতক জ্ঞান, কতক অজ্ঞান; ইহা বলিলে তাহার জ্ঞানেতে সীমা হইল। যিনি দেশেতে অনন্ত, কালেতে অনন্ত, মঙ্গল ভাবে অনন্ত—যাঁহার অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত প্রাণ, তিনিই একমাত্র সত্য পদার্থ। তিনিই সত্যের বিষয়—সত্যের আয়তন—সত্যের ভূমি। এই এক সত্য শব্দ তাঁহার সকল তত্ত্বের সমষ্টি-স্থান। সত্য ভাব পরিস্ফুটিত হইলে তাঁহার সকল স্বরূপ প্রকশ পায়। সত্যের মধ্যে জ্ঞান—প্রাণ— অনন্ত ভাব অন্তর্ভুত রহিয়াছে। তিনি সত্য স্বরূপ—তাঁহার কতক সাধু ভাব, কতক অসাধু ভাব; কতক মঙ্গল ভাব, কতক অমঙ্গল ভাব; এমত নহে;

তিনি পরিপূর্ণ মঙ্গল স্বরূপ। যিনি নির্দ্দোষ, নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক, পবিত্র-স্বরূপ, তাঁহার অপেক্ষা, সুন্দর বস্তু আর কি আছে। তিনিই "সত্যং শিবং সুন্দরং"।

সত্য শব্দ ঈশ্বরেতেই সম্পূর্ণ সংলগ্ন হয়। সত্যের সঙ্গে অন্যান্য বস্তুর কোন বিষয়ে মিল দেখিয়া তাহাকে সত্য। বলি। জড় বস্তুর অস্তিত্ব এবং শক্তিমাত্র দেখিয়া তাহাকে সত্য বলি। জীবাত্মার জ্ঞান ও চেতন শক্তি দেখিয়া জীবাত্মাকে সত্য বলি। কিন্তু এসমুদয় বস্তুরই আদি আছে, অন্ত আছে। দেশ, কাল, গুণ, সকল বিষয়েই জীবাত্মার সীমা করা যায়। কিন্তু যিনি অনাদনন্ত পূর্ণ-জ্ঞান—পূর্ণ-মঙ্গল তিনিই সত্য। এই সমুদয় জগৎ সংসারকে আপেক্ষিক সত্য বলা যাইতে পারে,কিন্তু ঈশ্বরই কুটস্থ সত্য। এ সমুদয় আপেক্ষিক সত্য, কেন না অল্পকাল স্থায়ী বস্তু অপেক্ষা দীর্ঘ কাল স্থায়ী বস্তু সত্য; জড় বস্তু অপেক্ষা জ্ঞান বস্তু সত্য; মৃত বস্তু অপেক্ষা সচেতন বস্তু সত্য। কিন্তু পারমার্থিক সত্য পদার্থ কেবল তিনিই। এই বলিয়াই যে জগৎসংসার ভ্রান্তি-মূলক মিথ্যা, তাহা নহে। এসমুদায় মায়াও নহে, স্বপ্নও নহে। যেহেতু ইহার মূল যিনি, তিনি সত্য। এই জগৎ সংসার সত্য-মূলক। আমারদিগের বুদ্ধিতে জগতের অস্তিত্ব, জীবাত্মার অস্তিত্ব, এবং পরমাত্মার অস্তিত্ব প্রকাশ পাইতেছে, ইহার মধ্যে যদি কোন এক অস্তিত্বকে স্বপ্নের প্রতীয়মান বস্তুবৎ মিথ্যা বলা হয়। তবে অন্য অন্য সকল অস্তিত্বকেই তাহার ন্যায় মিথ্যা বলিতে হয়। মূল সত্য হইতে নিঃসৃত জগৎকে মিথ্যা না বলিয়া আপেক্ষিক সত্য বলা উচিত। এই সমুদয় জগৎ সকল সময়েতেই যে বিদ্যমান আছে, তাহা নহে—এক সময়ে ছিল না; যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা হয়, তবে এক সময়ে থাকিবেক না। যাঁহার অস্তিত্ব সকল অস্তিত্বের মূলীভূত, তিনিই পরম সত্য নিত্য পদার্থ। আমরা এখানে যে কোন পদার্থ দেখিতে পাই, সকলই আশ্রিত পরিমিত অন্তবৎ পদার্থ। কিন্তু যিনি সর্ব্বশ্রয় অপরিমেয় অনন্ত পদার্থ, তিনিই সত্য। সকল সৃষ্ট বস্তুরই কোন না কোন বিষয়ে অভাব আছে, কিন্তু যাঁহার অভাব নাই, যিনি পরিপূর্ণ, তিনিই পারমার্থিক সত্য বস্তু। ঈশ্বরের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই সত্য বলা উচিত। এই এক শব্দে তাঁহার সকল তত্ত্বের উদ্বোধন হয়। সত্যের ভাব সকলেরই বুদ্ধি-ভূমিতে নিহিত আছে—সেই ভাব পরিস্ফুটিত হইলে দেখা যায় যে কেবল একমাত্র ঈশ্বরই সেই সত্য ভাবের বিষয়; ঈশ্বর ভিন্ন আর কোথাও সত্য শব্দ সংলগ্ন হয় না—সত্যের পর্যাপ্তি হয়। আমরা সত্যের যে সকল লক্ষণ প্রাপ্ত হইতেছি, তাহার সমুদয় লক্ষণ কেবল ঈশ্বরেতেই প্রাপ্ত হইতেছি।

সত্য যে বস্তু, তাহা কখন জড়বৎ মৃত বস্তু নহে; অতএব অমৃত চেতা ঈশ্বরই সত্য। সত্য যে বস্তু, তাহা কোন সময়ে আছে, কোন সময়ে নাই, এমত নহে; অতএব নিত্য পরমেশ্বরই সত্য। সত্য যে বস্তু তাহার উপরে কালের অধিকার নাই; কালেতে করিয়া তাহার ক্ষয় হয় না, তাহার পরিবর্ত্তন হয় না; অতএব অপরিবর্ত্তনীয় ধ্রুব ঈশ্বরই সত্য। সত্যের উপরে দেশের অধিকার নাই, দেশ

তাঁহাকে সীমাবদ্ধ করিতে পারে না; অতএব সর্ব্বব্যাপী তাপরিসীম ঈশ্বরই সত্য। সত্য যে বস্তু, তাহা কতক ভাল কতক মন্দ,তাহার কতক সদ্ভাব কতক অসদ্ভাব, এপ্রকার নহে; অতএব পূর্ণ-মঙ্গল-ভাব পরমেশ্বরই সত্য। সত্য যে বস্তু, তাহা আশ্রিত ও পরতন্ত্র বস্তু নহে, তাহ। কাহারও ইচ্ছার অধীন নহে; তাহার জনকও নাই, নিয়ন্তাও নাই; অতএব স্বপ্রকাশস্বরূপ স্বতন্ত্র পরমেশ্বরই সত্য। সত্যের সঙ্গে অভাবের সঙ্গে যোগ নাই; অতএব পরিপূর্ণ ঈশ্বরই সত্য। সত্যের যে মহান্ ভাব আমারদের বুদ্ধিতে নিহিত আছে; তাহা সেই পূর্ণ পুরুষ ভিন্ন আর কোথাও চরিতার্থ হয় না। আমাদের বুদ্ধিতে যে ধর্ম্মের ভাব আছে, তাহার মত যেমন ধার্ম্মিক পাওয়া যায় না; সেই প্রকার আমারদের সত্য ভাবের সহিত দৃশ্যমান কোন বস্তুরই ঐক্য দেখা যায় না। ঈশ্বরের লক্ষণ এবং সত্যের লক্ষণে সম্পর্ণ ঐক্য দেখিয়া ঈশ্বরকেই সত্য বলি। তিনি "সত্যজ্যোতীরসোহমৃতং।"

পঞ্চম উপদেশ।

ঈশ্বরানুরাগ এবং বিষয়-বিরাগ।

ব্রহ্মেতে অনুরাগ ভিন্ন ব্রহ্মদর্শন নিষ্ফল। অনুরাগের আলোকে ঈশ্বর আমারদিগের নিকটে যদ্রূপ প্রকাশিত হয়েন, এমন আর কিছুতেই হন না। অনুরাগের এরূপ প্রভা যে যে জ্ঞান প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকে, তাহা সমুজ্জ্বলিত হয়—যে সত্য ছায়ার ন্যায় মনে হয়, তাহা প্রদীপ্ত হয়— যে ধর্ম্ম আয়াস সাধ্য অতি কঠোর, তাহাও মধুস্বরূপ প্রতীয়মান হয়। ঈশ্বরই আমাদের সেই অনুরাগের প্রেরয়িতা এবং তিনি নিজেই তাহার বিষয়। তাঁহার জন্য ক্ষুধা তৃষ্ণা হইলে তিনি স্বয়ং আমাদের অন্নপান হয়েন। তাঁহার প্রতি অনুরাগ দৃঢ়তর হওয়া আমারদের সমুদায় ধর্ম্ম কার্য্যের অব্যর্থ ফল; আমরা বিষয়াকর্ষণকে বল-পূর্ব্বক নিরস্ত করিয়া যে অপূর্ব্ব ধর্মশিক্ষা লাভ করি, সে শিক্ষা কেবল ইহারই জন্য যে আমরা সেই সর্ব্বাতীত পরমেশ্বরের সহবাস লাভের যোগ্য হই। আমরা আমাদিগের দুর্ব্বিনীত প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া যে ধর্ম্মবল উপার্জন করি, তাহাতে কেবল আমাদের ঈশ্বরের পথে যাইবার শিক্ষা হয়। আমরা সে মুক্তি লাভের জন্য অনন্ত ভাবী কালের প্রতি দৃষ্টি করিতেছি, ধর্ম্ম আমারদের এই জীবদ্দশাতেই সেই মুক্তির সোপান প্রদর্শন করিতেছেন।

ধর্ম্ম যেমন আমারদিগকে ব্রহ্মধামে লইয়া যান,সেই রূপ এই পৃথিবী-লোকেও ধর্ম্ম আমারদের মন্ত্রী ও সহায়। কি বিষয়ী ব্যক্তি কি ঈশ্বরানুরাগী; ধর্ম্ম সকলেরই সুহৃৎ ও রক্ষক। যাহারা কেবল বিষয়সুখকেই প্রার্থনা করে, ধর্ম্মপথে থাকিলেই তাহাদের মঙ্গল—এবং যাঁহারা ঈশ্বরকে প্রার্থনা করেন, তাঁহারাও ধর্ম্মকেই অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে লাভ করিতে পারেন। এক দিকে শ্রেয়ঃ এক দিকে প্রেয়; এক দিকে সংসার, এক দিকে ঈশ্বর—এ দুয়েতেই সমান অনুরাগ হয় না। যাহাদের সংসারে অনুরাগ, তাহাদের ঈশ্বরে বিরাগ—যাহাদের ঈশ্বরে অনুরাগ তাহাদের সংসারে বিরাগ। গৃহত্যাগী হইয়া অরণ্যে বাস করাতেই যে বৈরাগ্য হয়, তাহা নহে। ঈশ্বরে অনুরাগই যথার্থ বৈরাগ্যপথ। ধর্মই সেই পথের প্রদর্শক। আমরা

কুপ্রবৃত্তির উপরে ধর্ম্মকে যত বার জয়ী হইতে দিই—ধর্ম্মের সুতীব্র ভর্ৎসনাতে স্বার্থপরতার কুটিল মন্ত্রণাকে যতবার নিরস্ত করি; ততই আমরা বল পাই, ততই আমারদের শিক্ষা হয়—বিষয়ের প্রতিস্রোতে যাইবার জন্য ততই প্রস্তুত হই। বিষয়-বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়াই আমারদের। মুক্তি। পাপ হইতে দূরে থাকিবার যে চেষ্টা, সেই চেষ্টাই আমারদের উৎকৃষ্ট শিক্ষা। ঈশ্বরে যে অটল অনুরাগ, সেই অনুরাগই আমারদের প্রকৃত বৈরাগ্য।

ঈশ্বরানুরাগের যে প্রকার স্বর্গীয় ভাব,—ধর্ম্মের যে প্রকার মাহাত্ম্য, তাহাতেই সুস্পষ্ট প্রতীতি হয় যে তাহা কেবল ইহ লোকের জন্য নহে। গর্ভস্থিত বালকের সুচারু অঙ্গসৌষ্ঠব ও কর্ম্মক্ষম ইন্দ্রিয় সকল দেখিলে যেমন তাহাকে চিরকাল গর্ভে থাকিবারই উপযুক্ত বোধ হয় না, কিন্তু এই কর্ম্মক্ষেত্র পৃথিবীর উপযুক্ত বলিয়া মনে হয়। সেইরূপ মনুষ্যের নিষ্কাম ধর্ম্মের অনুষ্ঠান—ঈশ্বরে নিস্বার্থ অনুরাগ দেখিয়া তাহাকে ভাবী কালের মহত্তর উচ্চতর অবস্থার উপযুক্ত বোধ হয়। এই সকল ভাব পৃথিবীর ভাব হইতে এত উচ্চতর, যে এখানে তাহাদের সম্যক্ চরিতার্থতা কখনই হয় না। বিষয়-সুখ অকাতরে বিসর্জন দেওয়া—পৃথিবীর খ্যাতি প্রতিপত্তিকে তুচ্ছ করা—কেবল এই পৃথিবীর জীবের পক্ষে কখনই সম্ভব হয় না।

যাহারা কেবল বিষয়-সুখের প্রতি লক্ষ্য করিয়া স্বর্গীয় ধর্ম্মকে প্রার্থনা করে, তাহাদের অতি নীচ লক্ষ্য। স্বোপর্জিত দুর্ল্লভ ধর্ম্ম-রত্নের বিনিময়ে ক্ষুদ্র বিষয়-সুখ কদাপি প্রার্থনীয় হইতে পারে না। ধর্ম্মের উপযুক্ত লক্ষ্য, ধর্ম্মের যোগ্য পুরস্কার, কেবল সেই ধর্ম্মাবহ একমাত্র পরমেশ্বর। ধর্ম্মপথ মধ্য পথ। ধর্ম্ম সংসার-বন্ধন রক্ষা করেল, ধর্ম্ম মোক্ষের সেতু হইয়া ঈশ্বরের নিকটে লইয়া যান। বিষয়সুখ ভোগের জন্য যে ধর্ম্ম, তাহা অতি নিকৃষ্ট—ঈশ্বরের জন্য যে ধর্ম্ম, তাহাই উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। আমরা প্রাণ পর্যন্ত পণ করিয়া যে ধর্ম্মকে উপার্জন ও রক্ষা করি; পার্থিব কোন বস্তু তাহার সম্যক্ লক্ষ্য কখনই হইতে পারে না। বিষয়-সুখের জন্য কে প্রাণ দিতে পারে? কিন্তু ধর্ম্মের জন্যই প্রাণ দেওয়া যায়। বিষয়-সুখকে যদি ধর্ম্মের পুরস্কার মনে করা যায়—স্বার্থপরতার চরিতার্থতা যদি ধর্ম্ম সাধনের উদ্দেশ্য হয়; তবে সে ধর্ম্ম রক্ষা করা বিষম দায়। বহু আয়াসে, বহু দিবসে, বহু কষ্টে, যদি সে ধর্ম্ম কিছু রক্ষা হয়; তবে পরম সৌভাগ্য। ধর্মকে যাহারা কেবল বিষয় উপভোগের উপায় করে, তাহারদের নিকটে ধর্ম্ম রক্ষার কত ব্যাঘাত, কত প্রতিবন্ধক। যখন ধর্ম্মের সঙ্গে সুখের সঙ্গে বিরোধ উপস্থিত হয়; তখন সেই সুখ বিসজন তাহাদের কি কষ্ট। ধর্ম্ম যখন গম্ভীরস্বরে ত্যাগের আদেশ প্রদান করে, তখন বিষয় ত্যাগ তাহাদের কি তক্ত বোধ হয়। তাহাদের লক্ষ্য কেবল সুখ, ধর্ম্ম কেবল তাহাদের উপায় মাত্র; এই হেতু ধর্ম্ম রক্ষা তাহাদের অতীব কষ্টদায়ক। ধর্ম্মের মূর্ত্তি তাহাদের নিকটে কখনই সৌন্দর্যময়ী হয় না, কিন্তু সর্ব্বদাই বিরস দেখায়। ধর্ম্মের পথ তাহারা কখনই সরল জ্ঞান করে না, কিন্তু কন্টকাবৃতই বোধ করিয়া থাকে।

এই জন্য ধর্ম্মের প্রাণ ঈশ্বরে অনুরাগ। ঈশ্বর-লাভের জন্যই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ উপায়; বিষয়-সুখের জন্য তাহা অতি কনিষ্ঠ উপায়। ঈশ্বর যিনি মহীয়ান্, তাঁহাকে পাইবার জন্যই ধর্ম্ম আমাদের সহায়; বিষয় সুখ যে কণীয়ান্, ধর্ম্ম তাহার যোগ্য বস্তু হইতে পারে না। এক দিকে সংসার, এক দিকে ঈশ্বর, মধ্যে ধর্ম্ম। এ দিকের মঙ্গলের জন্যও ধর্ম্ম অবশ্যক; ঈশ্বরের দিকে যাইবার জন্যও ধর্ম্ম সহায়। যাহারা ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়া সাংসারিক সুখ ভোগে রত থাকে; এখানে তাহারদের কথা হইতেছে। এখানে মনুষ্যের বিষয়ে বলা যাইতেছে; পশুতুল্য লোকের বিষয় নহে। সংসারের প্রতি লক্ষ্য করিয়া যাহারা ধর্ম্ম উপার্জন করে, ধর্ম্ম তাহারদের উপরের শ্রেণীতে থাকে; ঈশ্বরের প্রতি যাহাদের লক্ষ্য থাকে, ধর্ম্ম তাহাদের আশ্রয় ভূমিস্বরূপ। ধর্ম্মের প্রথম পুরস্কার ঈশ্বরে অনুরাগ সঞ্চার হওয়া; তাহার শেষ পুরস্কার ঈশ্বরকে লাভ করা। ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ হইলে ধর্ম্মের পথ আপনা হইতে সহজ হইয়া যায়। যাহাদিগের পবিত্র হৃদয়ে সেই বিশুদ্ধ অনুরাগ প্রথমেই প্রদীপ্ত হইয়াছে, ধর্ম্ম শিক্ষা যে দ্বিতীয় শ্রেণীর শিক্ষা, তাহা তাহাদের সহজেই সম্পন্ন হয়। কিন্তু যাহাদের প্রথমেই ঈশ্বরে অনুরাগ অনুভব না হয়, ধর্ম্মই ক্রমে তাহাদের মনে সেই অনুরাগ উদ্দীপন করেন। স্বার্থপরতার বিপরীত ভাব ঈশ্বরে অনুরাগ—ধর্ম্ম মধ্যবর্ত্তী শিক্ষা গুরু।

ধর্ম্মেতে যাঁহারদিগের শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে; ধর্ম্মের নৈসগিক সৌন্দর্য্য ও পাপের স্বাভাবিক মলিনত্ব যাঁহার প্রতীতি করিয়াছেন; তাঁহারা যে ঈশ্বরের পথেরই অভিমুখী, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বিষয় ত্যাগ, বিষয় বিসর্জন, প্রথমে ধর্ম্মের উপদেশে এসকলের শিক্ষা হয়। ধর্ম্মের অনুরোধে যত টুকু ত্যাগ স্বীকার করিতে পারি—বিষয়ের যত প্রতিকুলগামী হই—ঈশ্বরের পথে ততই অগ্রসর হইতে থাকি; ঈশ্বরের নিকটে যাইবার জন্য ততই বল পাই। বিষয় হইতে মন যত আকৃষ্ট হয়, বিষয়ের অতীত পদার্থের প্রতি ততই ধাবমান হয়। এদিকে যে পরিমাণে বিরাগ উপস্থিত হয়, ঈশ্বরে অনুরাগ সেই পরিমাণে উজ্জ্বল হইতে থাকে। ঈশ্বরে অনুরাগ যেমন প্রবল হইতে থাকে, তেমনি ধর্ম্মবল আরো বৃদ্ধি হয়, বিষয়াকর্ষণ আরো ক্ষীণ হয়। অতএব প্রথমে যাঁহার ধর্ম্মের প্রতি, কর্ত্তব্যের প্রতি শ্রদ্ধা হয়, ইহা নিশ্চয়, যে ঈশ্বর তাঁহার অনুরাগ শীঘ্রই তাঁহার মনে উদ্দীপন করেন। ঈশ্বর তো সর্ব্বত্রই তাঁহার ক্রোড় প্রসারিত করিয়া রাখিয়াছেন এবং প্রতিক্ষণেই আমারদিগকে আহ্বান করিতেছেন; আমরা তাঁহার সন্নিধানের উপযুক্ত হইলেই তিনি আমারদিগকে গ্রহণ করেন। তাঁহার নিকটে লইয়া যাইবার জন্য ধর্ম্মই প্রথমে আমাদের সহায় হয়েন।

বিষয়-সুখ যদি ধর্ম্মের লক্ষ্য হয়,তবে সে বিপরীত লক্ষ্য; সে লক্ষ্য সিদ্ধিতেও বিস্তর ব্যাঘাত। বিষয়-সুখ বিসর্জনের জন্য প্রস্তুত হইয়াই ধর্ম্ম-পথে গমন করিতে হয়; আনুষঙ্গিক যদি বিষয়-মুখ রক্ষা পায়, তবে ভালই। ধর্ম্ম কিছু বিষয়-সুখের

অনুচর নহে—কিন্তু ধর্মের অনুচর যদি বিষয়সুখ হয়, তবে তাহা অবশ্য সেব্য। আমরা আত্মসুখের জন্য ধর্ম্মকে প্রার্থনা করিলে সে কেবল স্বার্থপরতা মাত্র। স্বর্গের লোভে বা নরকের ভয়ে নিরাহারে দিন যাপন করাতে ধর্ম্ম হয় না। ধর্ম্মের ভাব নিঃস্বার্থ ভাব। বিষয়সুখ যে ধর্ম্মের অব্যর্থ পুরস্কার তাহা নহে; কিন্তু সুবিমল আত্ম-প্রসাদই ধর্ম্মের পুরস্কার,ঈশ্বর ধর্ম্মের শেষ পুরস্কার। ধর্ম্মের স্বর্গীয় জ্যোতির নিকটে স্বর্ণ রৌপ্য হীরকের পার্থিব জ্যোতি কোথায় থাকে? কেবল এক লক্ষ্যের দোষে ধর্ম্মকেও দূষিত মনে হয়। বিষয়-সুখই যাহার লক্ষ্য থাকে, সে পৃথিবীতে ধর্ম্মের হীনাবস্থা ও পাপের স্ফীতভাব দেখিয়া ঈশ্বরের অখণ্ড মঙ্গল স্বরূপেতেও দোষারোপ করিতে প্রবৃত্ত হয়। সে হয়তো এই মনে করে যে আমি সত্যের পথে ধর্মের পথে থাকিয়া কেবল লোকের নিকট হইতে নিষ্ঠুর আঘাত সহ্য করিতেছি; আর পাপী ব্যক্তি ধন মান প্রভুত্ব বর্দ্ধন করিয়া কেমন সুখে কাল যাপন করিতেছে অতএব ঈশ্বরের রাজ্যে কিছুই বিচার নাই। ধর্ম্মকে যাহার সুখের উপায়স্বরূপ জ্ঞান করে, তাহাদের মুখ হইতে এই রূপ অক্ষেপোক্তি অনেক সময় শ্রবণ করা যায়।

ধর্ম্ম যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া ঈশ্বরের পথে অগ্রসর হইতে হইলে ত্যাগ তো স্বীকার করিতেই হইবে—বিষয়-সুখ হইতে তো অনেক সময় পরিচ্যুত হইতেই হইবে—কুপ্রবৃত্তির বিপরীত পথে তো অনেকবার গমন করিতেই হইবে। আমারদের যদি মূলধন সঞ্চিত থাকে, তবে অতিরিক্ত ধনের ক্ষতিতে তেমন বিশেষ ক্ষতি বোধ হয় না। ঈশ্বরকে যিনি মূলধন রূপে সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছেন, বিষয় ত্যাগে তাহার ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। যিনি সকল সম্পদের সমুদ্রকে প্রাপ্ত হইয়াছেন, বিষয় বিপদকে তাঁহার বিপদ বোধ হয় না। তিনি সুখের সময় সেই সর্ব্বসুখদাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হইয়া সেই সুখকে দ্বিগুণিত করেন, এবং বিপদের সময় তিনি সেই সর্ব্বাশ্রয় পরমেশ্বরের আশ্রয়ে থাকিয়া নির্ভয়ে বিচরণ করেন। পাপই তাঁহার নিকটে অমঙ্গল; দুঃখও বাস্তবিক অমঙ্গল নহে, বিপদও বাস্তবিক অমঙ্গল নহে। আত্মার কিসে আত্ম-প্রসাদ থাকে—ঈশ্বর কিসে নিরন্তর জ্ঞান-চক্ষে প্রকাশিত থাকেন; ইচ্ছাতেই তাঁহার প্রাণগত যত্ন—এবং তদনুরূপ আচরণে তৎপর থাকেন। কিসে লোকে মান্য হইব, এজন্য তাঁহাকে কষ্ট পাইতে হয় না, ঈশ্বর হইতে পাছে বিচ্যুতি হয়, এই ভয়েই তিনি পাপ হইতে দূরে থাকেন; লোকেরা পাছে মন্দ বলে, ইহারই প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তাঁহার কপটতা কুটিলতা ছদ্মতা অভ্যাস করিতে হয় না।

যাঁহারা ধর্ম্মেতে অনেক সময় বিষয়-সুখের হানি দেখিয়া ঈশ্বরের মঙ্গল-স্বরূপে দোষারোপ করেন, তাঁহারা ধার্ম্মিকদিগের বৃদ্ধ-বয়সে যৌবন কালের বল বীর্য উদ্যমের হ্রাস দেখিয়াও তো সেই রূপ বলিতে পারেন? বিষয়-সুখ যদি ধর্ম্মের যথার্থ বিষয় হইত, তবে ধার্ম্মিক ব্যক্তিরাই অধিক বিষয়ী হইত; তবে ধর্ম্মের যত উপার্জন হইত, ইন্দ্রিয় সকল ততই বিবৃত দ্বার হইত, বিষয় লালসা ততই বৃদ্ধি

হইত, ভোগের শক্তি ততই প্রবলা হইত। কিন্তু বাস্তবিক ঠিক তাহার বিপরীত। ব্রহ্ম-রসগ্রহ ধার্ম্মিক বৃদ্ধ দিন দিন আপনাকে স্বীয় গম্য স্থানের নিকট জানিয়া সর্ব্বদাই প্রসন্ন ও হৃষ্ট থাকেন; বিষয়-ভোগের লালসা তাঁহাকে আর সুখ বা দুঃখ দিতে পারে না।

ধর্ম্মপরায়ণ সাধু ব্যক্তিরা বিষয়-সুখ হইতে বিরত হন বলিয়া যে পাপী ব্যক্তি নির্ব্বিঘ্নে থাকে, এমত নহে। পাপীর যে যন্ত্রণা সে সেই পাপী জানে, আর সেই অন্তর্যামী পুরুষই জানেন। তাহাদের যদি ধন, মান, ঐশর্য্য; অশ্ব, রথ, গজ, পর্য্যঙ্ক থাকে, তাহাতেই বা কি? তাহারা নরক সমান স্বকীয় হৃদয় জ্বালাতেই সর্ব্বদা অস্থির, তাহাদের কোন সুখ উপভোগের ক্ষমতাই থাকে না। তাহাদের নিকটে এই জগৎ দাব-দাহময় হয়। তথাপি করুণা-সিন্ধু পরমেশ্বর তাহারদিগকে পরিত্যাগ করেন না। তাহারদিগকে আপনিই দণ্ড বিধান দ্বারা বিপথ হইতে স্বপথে আহ্বান করেন।

ষষ্ঠ উপদেশ।

বিষয়-সুখ এবং ব্রহ্মানন্দ।

সেই ভূমাতেই আমাদের সুখ, অল্প বিষয়ে সুখ নাই। বিষয়-মুখে আমাদের আত্মা তৃপ্ত হয় না। বিষয়সুখ সকলই ক্ষণ-ভঙ্গুর, অতীব ক্ষুদ্র—কখনো বা ধর্ম্মের অনুকূল, কখনো বা প্রতিকূল; কখনো বা সেব্য, কখনো ত্যাজ্য। সেই ভূমা ঈশ্বরই আমাদের তৃপ্তির স্থল, আমাদের শান্তি-নিকেতন। ব্রহ্মানন্দই আমাদের ইহকাল ও পরকালের অবিনশ্বর সম্বল। বিষয়-সুখের তুলনায় ব্রহ্মানন্দ কালেতে অনন্ত এবং ভারেতেও অপরিমেয়। ব্রহ্মানন্দ যেমন স্থায়ী, তেমনি গভীর। মনুষ্যের আত্ম অতি মহৎ; ক্ষুদ্র পদার্থে নিরন্তর লিপ্ত থাকিয়া সে সুস্থ থাকিতে পারে না। যে সকল ব্যক্তি সৌভাগ্যের অজস্র দান উপভোগ করিতেছে; বিপুল মন, অতুল ঐশ্বর্য্য, মহোচ্চ পদ, অটল প্রভুত্ব ভোগেই এজীবনকে ব্যয় করিতেছে; তাহাদের তৃপ্তি-সুখ কখনই নাই; এই প্রকার অতৃপ্তিই সেই ভুমার প্রতি আমাদের আত্মার প্রধান আকর্ষণ। বিষয় শৃঙ্খলে বদ্ধ না থাকিয়া বিষয়ের অতীত পদার্থকে অন্বেষণ করি; ইহাই আমাদের উৎকৃষ্ট আধিকার। ধর্মের আদেশে বিষয় স্রোতের প্রতিকূলে ইচ্ছাকে নিয়োগ করিতে পারি, এই আমাদের আশ্চর্য্য শক্তি। যাঁহার আত্মা ধর্ম্ম-বলে সবল হইয়াছে—পুণ্য-জ্যোর্তিতে জ্যোতিষ্মন্ হইয়াছে, বিষয়-সুখ যে কি ক্ষুদ্র তাহা তিনিই বুঝিয়াছেন। আমরা সংসারের সহিত সংগ্রাম করিয়া—কুপ্রবৃত্তিকে বল পূর্ব্বক নিরস্ত করিয়া বহু আয়াসে বহু দিবসে যে ধর্ম্ম-রত্ন উপার্জন করি, কোন পার্থিব ধন কি তাহার বিনিময়ে গ্রহণ করা যাইতে পারে? কখনই না। ধর্ম্মের শেষ পুরস্কার ঈশ্বর। ঈশ্বরই আমাদের যথার্থ লক্ষ্য স্থান। তাঁহা হইতে বিচ্যুত হইয়া তান্য যে দিকে গমন করি, সেই দিকই তিমিরাবৃত শূন্য। দিগ্দর্শনের শলাকা যেমন স্বাভাবিক অবস্থায় উত্তর দক্ষিণ মুখীন হইয়া থাকে এবং বাহির হইতে বিয়

পাইলেই সেই শলাকা বিপরীত দিকে চালিত হয়, আমাদের আত্মাও সেই প্রকার। আত্মার স্বাভাবিক ভাবস্থাতে সে ঈশ্বরের দিকেই দৃষ্টি করে। কিন্তু যদি বিষয়াকর্ষণ প্রবল হয়—যদি র দৃষ্টান্ত বা কুসংসর্গের জাল বিস্তৃত হয়; তবেই সে অন্য দিকে গমন করে। আত্মার সুস্থাবস্থাতে ঈশ্বরই তাহার উপজীবিকা, ধর্ম্মই তাহার মন্ত্রী। পাপই বিকৃতি। ঈশ্বর হইতে বিচ্যুতিই অস্বাভাবিক। বালক। কাল অবধিই ঈশ্বরের ভাব এবং ধর্ম্মের ভাব অল্প অল্প পরিস্ফুটিত হইতে থাকে। বিষয়-জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে বালকের মনে ঈশ্বর-জ্ঞান তারস্ত হয় এবং বিষয়-বুদ্ধির সহিত তাহার ধর্ম-বুদ্ধির উদ্বোধ হইতে থাকে। সেই স্বাভাবিক ঈশ্বরের ভাব এবং সেই স্বাভাবিক ধর্ম-বুদ্ধির উদ্দীপন করিয়া দিবার জন্য প্রথম হইতেই তাহার ধর্ম্ম প্রদর্শকের সহায় আবশ্যক। সত্য কথা বলাই বালকদিগের স্বাভাবিক ভাব; তাহারা কুটিলতা শিক্ষা না করিলে আর তাদের মিথ্যা বলিতে প্রবৃত্তি হয় না। পিতা মাতার প্রতি বালকদিগের যে একটি নির্ভরের ভাব—একটি অটল নিষ্ঠা আছে; বয়োবৃদ্ধি সহকারে সেই সকল ভাব ঈশ্বরেতেই পরিচালিত হওয়াই স্বভাবিক; কিন্তু সেই সকলের উদ্দীপন হয় না বলিয়া এক্ষণে নির্ব্বাণ প্রায় দেখা যাইতেছে। যখন তাহারা দেখে, তাহাদের পিতা মাতা কেবলই বিষয়ে মগ্ন আছেন, ঈশ্বরের উপাসনাতে কাহারো মন নাই; তখন কিরূপে তাহাদের ঈশ্বরের ভাব সমুজ্জ্বলিত হইতে পারে? এই হেতু পরিবারের মধ্যে এক জন সৎ আচার্য্য থাকা অত্যন্ত আবশ্যক। এই ব্রহ্মবিদ্যালয়ের কেবল এই উদ্দেশ্য, যাহাতে ধর্ম্মের ভাব এবং ঈশ্বরের ভাব সকলের আত্মাতে জাগ্রৎ হয়। ধর্ম্মের ভাব, কর্তব্য জ্ঞান, ঈশ্বর স্পৃহা সকলেরই আছে; কিন্তু তাহা উদ্বোধন করাই ইহার উদ্দেশ্য। আমরা দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত যেমন জড়ীভুত হইতেছি, অজ্ঞান বশতঃ সে রূপ নয়। আমরা যাহা যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া জানি—ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া মান্য করি, তাহা যদি অনুষ্ঠানে পরিণত করিতে পারি; তবে আমারদের সৌভাগ্যের সীমা কি থাকে? ধর্মের আদেশ অমরদের বুদ্ধি-ভুমিতে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে—ধর্ম্মের তীব্রতর ভৎর্সনাতে কুপ্রবৃত্তি-সকল অনেক সময়ে সঙ্কুচিত হইতেছে; কিন্তু সেই ধর্ম্মের বলকে আরো বলবান করা আমাদের প্রয়োজন। আমরা যদি আমারদের ঈশ্বরের ভাব কেবল স্বভাবের হস্তে অর্পণ করিয়াই ক্ষান্ত থাকি, তবে তাহাতে কোন ফলই দর্শে না। যদি শর দেখিয়া আমাদের বৈরাগ্য উপস্থিত হয়—যদি বিপদে পড়িয়াই ঈশ্বরকে মনে হয়—তবে তাহাতে কি হইতে পারে? আমরা সকল সময়েতেই যে তাঁহার আশ্রিত এবং তিনি আমাদের একমাত্র আশ্রয়, এই ভাব নিরন্তর মনে রাখা কর্ত্তব্য। আমরা যেমন বন্ধুর সহিত এক প্রকার সম্বন্ধ নিবদ্ধ করি, সেই রূপ ঈশ্বরের সহিত সম্বন্ধ নিবদ্ধ না করিলে তাঁহাকে জানার কোন ফল নাই। আমরা জানিলাম, ঈশ্বর আমারদিগের পরম পিতা, আমরা সকলেই তাঁহার পুত্র। কিন্তু পুত্রের ন্যায় যদি তাঁহাকে ভক্তি না করি, পুত্রের ন্যায় তাঁহাতে নির্ভর না করি; তবে সে জ্ঞান থাকা না থাকা সমান। আমরা জানিলাম ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপী; কিন্তু অল্পজ্ঞ মনুষকে যে রূপ সাক্ষাৎ দেখি, তাঁহাকে যদি তদ্রুপ করিয়াও না দেখি;

সামান্য লোকের অনুরোধে কোন অসৎ কর্ম্ম হইতে যেমন নিবৃত্ত হই, তাঁহার অনুরোধ ততটুকুও রক্ষা করিয়া না চলি; তবে সে জ্ঞান বৃথা। আমরা যদি কর্ম্মের সময় ইশ্বরকে বিস্মৃত হইয়া থাকি এবং কেবল উপাসনার সময়েই তাঁহাকে মনে করি; তবে এখনো তাহার সহিত সে প্রকার সম্বন্ধ নিবদ্ধ হয় নাই। কর্ম্মের সময়ই আপনার কর্ম্ম—উপাসনার সময়ই তাঁহার কার্য্য; এমত নহে। ধর্ম্ম-কার্য্য যাহা কিছু করি; সকলই তাঁহার কার্য্য—তাঁহার প্রিয় কার্য্য; স্বার্থপরতার কুমন্ত্রণাতে যে কিছু ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ কার্য্য করি, তাহাই তাঁহার কার্য্য নহে; তাহাই পরিহার করা আমারদিগের প্রাণ পণে কর্ত্তব্য। যখন তিনি আমাদের ন্যায়বান্ রাজা আর আমরা সকলেই তাঁহার প্রজা; তখন তাঁহার আদেশ পালন না করা কি বিগর্হিত কর্ম্ম। যখন তিনি আমাদের প্রভু, আর আমরা তাঁহার আজ্ঞাধীন ভৃত্য; তখন তাঁহার কার্য্যে অবহেলা করা কি অকৃতজ্ঞতার কর্ম্ম!

ঈশ্বরের সহিত সম্বন্ধ নিবদ্ধ করা ইহ কালেই আবশ্যক; নতুবা আমারদের মহতী বিনষ্টি। কি কর্ম্মক্ষেত্রে কি ব্রাহ্মসমাজে সকল সময়েই আমরা যেন তাঁহার কার্য্যে এবং তাঁহার উপাসনাতে নিযুক্ত থাকি। তাঁহার উপাসনাতেই আমারদের দেবত্ব হয়। সংসার দুর্দ্দিবসের ঝঞ্ঝা শিলাপাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য ব্রহ্ম রূপ-নিকেতন আমাদের এখানেই আবশ্যক। আমরা যে অবস্থায় থাকি না কেন, কেহই তাঁহা হইতে আমারদিগকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে না। সম্পদ্ এবং সম্পদের অনুচরেরাও যদি অমারদিগকে পরিত্যাগ করে—বন্ধুগণ যদিও বিচ্ছিন্ন হয়; তথাপি ঈশ্বর হইতে আমরা বিচ্ছিন্ন নহি। আমরা নির্জনেও একাকী নহি—বিপদের সময়ও নিরাশ্রিত নহি; কিন্তু ঈশ্বর আমাদের সহিত সর্ব্বদাই আছেন এবং তিনি তাঁহার শীতল আশ্রয়ের ছায়া সর্ব্বদাই বিস্তার করিতেছেন। এই বিস্তীর্ণ জগৎ শ্মসান তুল্য শূন্য নহে। কিন্তু ইহা উৎসব-পূর্ণ দেব-মন্দির।

যে ব্যক্তি ঈশ্বর হইতে পরিচ্যুত, তাহার কিছুতেই শান্তি নাই। সাংসারিক সম্পদ্ই তাহার জীবন সর্ব্বস্ব— সাংসারিক বিপদ্ই তাহার মৃত্যু তুল্য। বিষয় লোলুপ ব্যক্তি বিষয় লইয়া যে সুখী থাকিতে পারে, তাহাও নহে। বিষয় পাইবার পূর্ব্বে যে রূপ উদ্যোগ থাকে, যে রূপ উদ্যম থাকে, তাহা পাইলে আর সে রূপ থাকে না; পুনর্ব্বার নুতন বিষয়ের পাশ্চাতে মন ধাবমান হয়। বিষয় লাভে তৃপ্তি-সুখ কখনই হয় না। প্রথমতঃ বিষয় পাইবার জন্য কেমন ব্যগ্রতা ও কি কষ্ট। দ্বিতীয়তঃ না পাইলে কেমন তাসুখ! তৃতীয়তঃ বিষয় পাইলেও তাহাতে অতৃপ্তি! চতুর্থতঃ পাইবার পর তাহা নস্ট হইলে কেমন যন্ত্রণা! এই সকল যন্ত্রণা ও বিড়ম্বনার মধ্যে দিয়াই ঘোর বিষয়ী ব্যক্তির অহর্নিশ বিচরণ করিতে হয়। কোথায় যে সে শান্তি পাইবে, এমন স্থান নাই। তাহারা অমৃতের পুত্র হইয়া সংসার চক্রেই আবর্ত্তিত হইতে থাকে, কোথাও শান্তি পায় না। তাহারা সুখ-মরীচিকায় প্রতিবার আশাসিত এবং প্রতিবার প্রবঞ্চিত হইয়া কেবল ঘূর্ণায়মান হয় এবং পরিশেষে হয়

তো সংসারের প্রতি মনুষ্যের প্রতি বিরক্ত হইয়া ঈশ্বরের মঙ্গল-স্বরূপেও দোষারোপ করিতে প্রবৃত্ত হয়।

সেই সকল ব্যক্তিরা ইহা অবগত নহে, যে ক্ষুদ্র বিষয় লইয়া মনুষ্য কখনই তৃপ্ত থাকিতে পারে না। যাঁহার ভূমা ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা সর্ব্বতোভাবেই পরিতৃপ্ত থাকেন। ঈশ্বরকে যাঁহারা মূল ধন রূপে সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছেন; পার্থিব বিষয়ভাবে তাঁহারা মুমূর্ষু হয়েন না। বিষয় জনিত হর্ষ, শোক; সংসারের বিপদ সম্পদ; তাঁহারদিগকে অধিকার করিতে পারে না। সকল অবস্থাতে তাঁহারা কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়াই মুখী থাকেন। ধন পাইলেও তাঁহাদের এক প্রকার কর্ত্তব্য; দরিদ্রাবস্থাতেও তাঁহাদের অন্যরূপ কর্তব্য। তাঁহারা যে কোন কর্ম্ম করেন, তাহা ঈশরেতেই সমর্পণ করেন; তাঁহার প্রিয় কার্য্য হইতে কেহই তাঁহারদিগকে আকৃষ্ট করিতে পারে না! তাঁহারা সেই মহান্ সুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া কি মহত্ত্বই প্রাপ্ত হইয়াছেন; তাঁহারা সেই সকল সম্পদের সম্পদকে পাইয়া সুসম্পন্ন হইয়াছেন।

বিষয়-সুখেই যদি আমরা প্রমত্ত থাকি—সংসার ভিন্ন যদি আমারদের নিকটে আর সকলই অসার হয়; তবে আমরা আমাদের মহত্ত্বর শ্রেষ্ঠতর অধিকার হইতে প্রচ্যুত হই। ঈশ্বরের সহিত আমারদের যে সকল সম্বন্ধ, তাহা অননুভূত থাকে। ধর্ম্মের যে সকল মহান্ ভাব, তাহা অব্যক্ত রূপে স্থিতি করে। সুখই যাহাদের ধর্ম্ম এবং দুঃখই পাপ, নিঃস্বার্থ ভাব যে কি, তাহা তাহারা কি প্রকারে বুঝিবে? ব্রহ্মপরায়ণ ব্যক্তি যে ধর্ম্মের জন্য অনায়াসে প্রাণ দান করিতে উদ্যত, তাঁহারদিগের নিকটে সে কেবল ভ্রান্তি মাত্র। ঈশ্বর প্রীতি যে মনুষ্যকে দেবত্ব পদ স্থাপিত করে, সে কল্পনা মাত্র। সেই পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তিগণ অশেষ শাস্ত্র-সিন্ধু মন্থন করিয়া এই স্থির করেন, যে মনুষ্যের সকল কর্ম্মের সমুদয় ধর্ম্মের লক্ষ্য কেবল স্বার্থপরতা। তাহারা মনুষ্যের মহদ্ভাব-সকলকে পশু ভাবের তুল্য করিতে চাহে এবং তাহার জ্ঞান ধর্ম্ম-বুদ্ধি সম্পন্ন আত্মাকে জড় করিতে চাহে। তাহারা মনুয্যের আশা, ভরশা, জ্ঞান ধর্ম্ম, সকলই এই সঙ্কীর্ণ স্থান ও সঙ্কীর্ণ কালেই বদ্ধ করিতে চাহে এবং মৃত্যুর সঙ্গেই তাহার আত্মার ধ্বংস ও বিনাশ ঘোষণা করে। সাবধান যেন তাহারদের উপদেশ-গরল কেহ প্রমাদ গ্রস্ত হইয়া ভক্ষণ না করেন।

যাঁহারা ধর্ম্মের পথে দণ্ডায়মান আছেন এবং পুণ্য-পদবীতে আরোহণ করিতেছেন, তাঁহারা উক্ত প্রকার ভ্রমজালে কদাপি পতিত হয়েন না। পুণ্যের যে কি মনোহর মূর্ত্তি—ঈশ্বর-প্রীতি যে কি রমণীয় পদার্থ—ব্রহ্মানন্দ যে কি মহান্—ঈশ্বরের সহিত যে কি প্রকার চির-সম্বন্ধ। তাঁহারা ইহা পরীক্ষাতেই জানিতেছেন, বৃথা যুক্তিতে তাঁহারা ভুলিবার নহেন। একেতো আমাদের দেশ অধর্ম্মের আলয় হইয়াছে, তাহাতে বিজ্ঞান-শাস্ত্রও যদি নীচ হীন পাপ কলঙ্কিত হয়, উপদেষ্টাও যদি

সেই রূপ হয়, গৃহীতাও যদি বিনীত ভাবে সেই সকল উপদেশ গ্রহণ করেন; তবে এদেশের মঙ্গল কোথায়? যাহারা এই প্রকার বিষম বিষয়ের উপদেশ প্রদান করেন, তাঁহারা বোধ হয় আপনারদের স্বভাবের প্রতি দৃষ্টি করিয়াই এই রূপ উপদেশ দিয়া থাকেন; অনন্ত কালের নিমিত্তে আমাদের আত্মার সহিত পরমাত্মার যে সম্বন্ধ আছে, তাহা তাঁহারা বিনাশ করিতে চাহেন। তাঁহাদিগকে এক প্রকার আত্মঘাতী বলিলেও বলা যায়। একবার পরীক্ষা করিয়া দেখ, ধর্ম্মের কি পবিত্র, প্রশান্ত ভাব—ভূমা ঈশ্বরেতে আমারদের কেমন আরাম—ব্রহ্মানন্দ কি সুগভীর, কি স্থায়ী; তবে আর ভ্রমপথের পথিক হইতে হইবে না। আমরা জ্ঞানালাপেতেই যেন তৃপ্ত না থাকি। ঈশ্বরেতে আমাদের কত দূর প্রীতি জন্মিয়াছে, তাহা তাঁহার কার্য্য করিবার সময়েই পরীক্ষা হয়। তাঁহাকে প্রীতি কর এবং আনন্দের সহিত তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন কর। ইহাতেই মঙ্গল, ইহাতেই মুক্তি।

সপ্তম উপদেশ।

পরলোক।

পরলোক এবং পরলোকের সাধন অবিবেকীর নিকটে প্রতিভাত হয় না। তাহারা পরলোকের বিষয় কি বুঝিবে? বিষয়ের সঙ্গে জড়িত থাকিয়া তাহারা আপনাকেও বিস্মৃত হইয়া যায়। যদি বিষয়ই সার, বিষয়ই সত্য, এইরূপ জ্ঞান হয়—যদি গণনার সময়ে আপনাকে ছড়িয়াই গণনা করা যায়; তবে পরলোকের সাধন কোথা হইতে হইবে? বিষয়ই সর্ব্বস্ব, বিষয়ী যে আমি তাহা কিছুই নহে; এই প্রকার ভাবিয়া কার্য্য করিলে পরলোকের সাধন কখনই হইতে পারে না। পরলোকের সাধনের পূর্ব্বে আত্মদৃষ্টি আবশ্যক। বরং বস্তুর অস্তিত্বের প্রতি সংশয় উপস্থিত হইতে পারে; কিন্তু আমি আছি, ইহাতে আর কাহারও সংশয় হয় না। বাহিরের বস্তুর প্রতি সংশয় উপস্থিত হইলে গাঢ় প্রমাণ আবশ্যক—দর্শনেন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রমাণ না হইলে স্পর্শেন্দ্রিয়ের প্রমাণ চাই—বাধা ও প্রতিবন্ধক পাইলে সে প্রমাণ আরো দৃঢ়তর হয়; কিন্তু আপনাকে জানিবার জন্য আর প্রমাণের আবশ্যক করে না, অন্য সাক্ষীর সাক্ষ্যতার তার প্রয়োজন হয় না; যেহেতু আপনার সাক্ষী আপনিই। আত্মজ্ঞান কেবল মনুয্যেরই আছে। মনুষ্য আত্মজ্ঞান বিহীন হুইলে সে নিশাগ্রন্তু ব্যক্তির ন্যায় কার্য্য করে। নিশাগ্রস্ত ব্যক্তি যেমন স্বপ্নেতে আপনাকে না জানিয়া কর্ম্ম করিতে থাকে এবং তাহাকে কেবল জাগ্রত করিয়া দিলেই সে সকল বুঝিতে পারে; সেই রূপ মনুষ্যও যখন আত্মজ্ঞান শূন্য হইয়া কার্য্য করে, তখন তাহাকে কেবল জাগ্রৎ করিয়া দিবার আবশ্যক। পশুদের আত্মজ্ঞান নাই—তাহারা কর্ত্তৃত্ব বুঝিয়া কার্য্য করে না, বিষয়াকর্ষণেই ধাবিত হয়। মনুয্যর আত্মজ্ঞান আছে, কিন্তু তাহারা কখন কখন আত্ম বিস্মৃত হয়, তাহার বিস্মৃতি ভঙ্গের নিমিত্তে তাহাকে জাগ্রৎ করিয়া দিলেই হয়। মনুষ্যের এক এক সময়ে এমন হীন অবস্থা হইয়া পড়ে, যে সে আর আপনার প্রতি দৃষ্টি করে না। যাহার দৈর্ঘ্য প্রস্থ আছে—যাহা দেখা যায় স্পর্শ করা যায়, তাহাই সে সত্য মনে করে, আর যাহা হ্রস্ব দীর্ঘ নহে, যাহা অদৃশ্য তাহাই তাহার নিকটে অসত্য রূপে প্রতীয়মাণ হয়। কিন্তু বস্তুতঃ ঠিক তার বিপরীত। বরং দৈর্ঘ্য প্রস্থ বিশিষ্ট বস্তুর প্রতি সংশয় জন্মিতে

পারে, কিন্তু আমাকে আমি কখনই সংশয় করিতে পারি না। সংশয় করে কে? না আমি; অতএব আমি আছি, নতুবা আমার সংশয়ও মিথ্যা; এসময়ে সংশয় আপনাকেই আপনি ছেদন করে। আমি আর প্রত্যক্ষের বিষয় নহি, কিন্তু আমি আপনাকেই আপনি বুঝিতে পারি। আমি একই বস্তু—আমার সমুদয় চিন্তা—সমুদয় ভাব—সমুদায় কামনা ইহাতে আশ্রিত রহিয়াছে। আমি বিভাগ যোগ্য নহি। শিশুকালে যে আমি ছিলাম; অদ্যও সেই আমি আছি। আমি স্থূল নহি, অণু নহি, হ্রস্ব নহি, দীর্ঘ নহি। আমি আকাশে নাই। আমার চিন্তা মস্তিষ্কে আছে—ভাবনা হৃদয়ে আছে—ব্যথা অঙ্গুলিতে আছে; এমত নহে। কিন্তু আমার যে কিছু চিন্তা যে কিছু ভাব, যে কিছু ক্লেশ, তাহা আমারই। সে সকল শরীরে আরোপ করা অতীব ভ্রান্তি। যে হেতু চিন্তা প্রভৃতি সমুদয় বৃত্তি কেবলই আত্মারই। এ সকল আত্মতত্ত্ব বুঝিবার জন্য প্রমাণের গাঢ়ত্ব আবশ্যক করে না।

আমি এবং আমার শরীর, এ দুইকে পৃথক্ করিয়া বুঝিলে পরকালের প্রমাণ সহজেই হয়। আমি আমার শরীর হইতে ভিন্ন। আমি যখন দূরবীক্ষণ সহকারে গ্রহ উপগ্রহের গতিবিধি নিরূপণ করি; তখন সে দূরবীক্ষণও আমি নহি, এবং আমার চক্ষুও আমি নহি। আমার মস্তিষ্কও আমি নহি, আমার হৃদয়ও আমি নহি। অন্নপানে শরীরের পুষ্টি হইতেছে, রোগ দ্বারা শরীর ক্ষয় হইতেছে এবং কয়েক বৎসরের মধ্যে তাহার প্রত্যেক পরমাণু একেবারে পরিবর্ত্ত হইয়া যাইতেছে; কিন্তু আমি যে একই সে একই রহিয়াছে। বিষয় আর বিষয়ী অন্ধকার আর আলোকের ন্যায় পরস্পর বিভিন্ন স্বভাব। যাঁহারা ইহাদের মধ্যে সমুদয় প্রভেদ বিলীন করিতে চাহেন, তাঁহারা সহস্র সহস্র যুক্তিতেও তাহা অতি সামান্য লোককেও বুঝাইতে পারেন না। বিষয় আর বিষয়ী; ইহাদের মধ্যে কিছুতেই ঐক্য নাই—এ দুয়ের কোন এক গুণও সমান নহে। আকৃতি, বিস্তৃতি, বিষয়ের গুণ; আর স্মরণ, তুলনা, অনুমান; প্রীতি, দয়া; শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা; এবিষয়ীর গুণ; ইহার মধ্যে কিছুতেই সাদৃশ্য নাই। একজন দ্রষ্টা, স্প্রষ্টা, ঘ্রাতা, মন্তা, বোদ্ধা, কর্ত্তা; অপর আমাদের প্রত্যক্ষের বিষয়। আকাশ নাই আর জড় বস্তু আছে; এ আমরা মনেই করিতে পারি না। কিন্তু আকাশ বিষয়ীর অবলম্বন নহে।

যখন শরীর আত্মা এত পৃথক্; তখন মৃত্যুর পরেই আত্মার কি প্রকারে বিনাশ হইতে পারে। আমরা কোন বস্তুরই বিনাশ কল্পনা করিতে পারি না। যাঁহার সৃজন শক্তিতে এ সমুদয় সৃষ্ট হইয়াছে, তাঁহারই সংহার—শক্তিতে এ সমুদয় ধ্বংস হইতে পারে। ঈশ্বরের পালনী ইচ্ছার বিরাম ব্যতীত সৃষ্টির কণামাত্রও ধংস হইতে পারে না। কিন্তু ঈশ্বরের সে ইচ্ছার বিরাম হইয়াছে কি না; এই প্রশ্নের উত্তর আমরা জড় বস্তু হইতেই প্রাপ্ত হইতেছি। জড় বস্তু মধ্যে কোন বস্তুরই বিনাশ হইতেছে না। জল বাষ্প রূপে উত্থিত হইয়া শুষ্ক হইয়া যাইতেছে; কিন্তু সেই বাষ্প আবার জল মূর্ত্তি ধারণ করিতেছে। শুষ্ক বৃক্ষ-পত্র-সকল ভূমিতলে পতিত হইয়া অদৃশ্য

হইতেছে; কিন্তু তাহাই আবার বাষ্পীয় পদার্থ বিশেষে পরিণত হইয়া উদ্ভিজ্জের বুদ্ধি বিষয়ে সাহায্য করিতেছে। মৃত দেহের প্রত্যেক অঙ্গ, প্রত্যেক অস্থি, প্রত্যেক পরমাণু বিচ্ছিন্ন হইতেছে; কিন্তু তাহার কিছুই বিনষ্ট হইতেছে। অতএব কোন্ উপমিতি দ্বারা ইহা সপ্রমাণ হয় যে মৃত্যুর পরে আত্মারই বিনাশ হইবে। যখন একটি জড়ীয় পরমাণু বিনষ্ট হইতে পারে না, তখন কি ঈশ্বর আত্মার বিনাশই ইচ্ছা করিবেন।

কিন্তু মৃত্যুকালে শরীর যেমন ভঙ্গ হইয়া যায়, আত্মার কি সেই রূপে ভঙ্গও হইতে পারে? ইহার উত্তর না। শরীর পরমাণু বিশিষ্ট; জীবাত্মা একই বস্তু। শরীর অবয়ব বিশিষ্ট; জীবাত্মা অবয়ব বর্জ্জিত। জীবাত্মা আকাশে নাই; অতএব তাহা বিস্তৃতি শূন্য। জীবাত্মা একই বস্তু, ইহার জন্য বহু তর প্রমাণ ও যুক্তির অবশ্যক করে না। আমি একই; দুই নহি, তিন নহি; ইহা আমাদের আত্ম-প্রত্যয়-সিদ্ধ। যদি কাহাকেও জিজ্ঞাসা করা যায়, তুমি কয় জন? তাহা হইলে সে এই প্রশ্নে হাস্য করিবে। আমাদের শরীরের যদিও সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইতেছে, কিন্তু যে আমি পূর্ব্বেও ছিলাম, সেই আমি এখনও আছি; এই জ্ঞানটি প্রত্যেক মানসিক ক্রিয়ার মূলেই নিহিত রহিয়াছে। আমাদের বিচিত্র ভাব—বিচিত্র মনোবৃত্তি; এই একই বস্তুতে অনুভব করি। আমি একই, এই জ্ঞানটি না থাকিলে আমরা কোন বিষয়কেই বিষয় বলিয়া অবধারণ করিতে পারিতাম না; সকলই আমাদের নিকটে অসম্বদ্ধ বিচ্ছিন্ন হইত এবং আমাদের নিকটে তাহাদের থাকা আর না থাকা সমান হইত। আমি একই বস্তু, এই জন্যই আমার ভঙ্গ হইতে পারে না। শরীর পরমাণু বিশিষ্ট, অতএব সেই সকল পরমাণু পৃথক্ হইলে সে শরীর ভগ্ন হইতে পারে, কিন্তু আত্মা একই, তাহার বিনাশও নাই এবং ভঙ্গও নাই।

এখানে আমাদের আত্মা শরীরে বদ্ধ রহিয়াছে। কেহ কেহ বলে যে শরীর হইতে মুক্ত হইলেই আত্মার বিনাশ হইবে। একি নিদারুণ উক্তি, একি নিদারুণ বিশ্বাস। কারারুদ্ধ ব্যক্তিকে যদি এই প্রকার আশ্বাস দেওয়া যায় যে তুমি যতদিন বদ্ধ আছ, ততদিনই তোমার মঙ্গল; মুক্ত হইলেই তোমার মৃত্যু; তাহা হইলে তাহার কষ্ট কি দুর্ব্বিষহ হইয়া উঠে। আমাদের শরীরই কারাগৃহ। ইহাতে আত্মার স্বাভাবিক স্ফুর্ত্তি ও প্রভা নিরুদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। মনুষ্য আহার নিদ্রা ব্যতীত জীবন ধারণ করিতে পারে না; কিন্তু তিনি আহার নিদ্রার জন্যও জীবন ধারন করেন নাই। শরীরের সহিত আত্মার অস্থায়ী স্বম্বন্ধ; কিন্তু কেবল এই শরীরের লালন পালনেই হয়তো মনুষ্যের সমস্ত জীবন গত হয়। কাচ যেমন ভূমিতে পড়িলেই খণ্ড খণ্ড হয়, শরীরও সেই প্রকার। একবার মাত্র নিঃশ্বাস রুদ্ধ হইলে শরীরের প্রাণ বিয়োগ হয়। এখানে আত্মার স্বাভাবিক স্বাধীনত্ব কত সময়ে বিনাশ প্রাপ্ত হইতেছে এবং সে দাসের ন্যায় এই শরীরের উপরে কত বিষয়ে নির্ভর করিতেছে। এক এক সময়ে আমাদের মনের ভাব এত অধিক হয়, এত গাঢ় হয়,

এ দ্রুত বেগে সঞ্চিত হয়, যে বাক্য তাহা বলিতে গিয়া স্তব্ধ হয়। দেখিবার জন্য আত্মার চক্ষু-রূপ দুই গবাক্ষ চাই; গমন করিবার জন্য পদ রূপ দুই ক্ষীণ যষ্টি আবশ্যক করে। সাক্ষাৎ মৃত্যুর প্রতিকৃতি নিদ্রা প্রতি রজনীতে আত্মাকে মৃতবৎ করে। এখানে আত্ম মৃত্যু আর অমৃতের সন্ধি স্থানে রহিয়াছে। আমৃত ধামই তাহার যথার্থ ধাম; মুক্ত ভাবই তাহার স্বাভাবিক ভাব। যত দিন আমাদের আত্মা কারা-বদ্ধ, তত দিন জীবিত, মুক্ত হইলেই মৃত; এঅতি ভয়ানক কথা! ইহা সত্য হইলে পৃথিবীর সমুদয় ঘটনাই অসংলগ্ন হয়; মনুষ্যের জীবন সম্পূর্ণরূপে নিস্ফল হয়। ঈশ্বরের মঙ্গল-স্বরূপের উপরে নির্ভর করিয়া একথা কেহই বলিতে পারেন না। শরীর আমাদের সর্ব্বস্ব নয়, আত্মাই সার পদার্থ। শরীর এবং আত্মার যোগ হওয়াই আশ্চর্য ব্যাপার; আত্মা পৃথক্ থাকা কিছুই আশ্চর্য্য নহে। পরীর ব্যতীত যে জীবাত্মা থাকিতে পারে, ইহা মনে করা অতি সহজ; শরীরের সহিত তাহার কি রূপে সম্বন্ধ হইল, ইহাই বুঝা কঠিন।

পরকালের প্রত্যয় চতুর্দ্দিক্ হইতেই দ্রঢ়ীভূত হইতেছে। বিশেষতঃ যখন আমরা আমাদের কর্ত্তৃত্ব বুঝিতে পারি, তখন পরকালের বিশ্বাস অত্যন্ত উজ্জ্বল হয়। যখন আমরা বিষয়ের প্রতিকূলে গিয়া আপনাকে স্বতন্ত্র রূপে উপলব্ধি করিতে পারি—তখন পরকালের ছায়া এখানেই দেখিতে পাই। শত শত যুক্তি একত্র হইলেও আমারদিগকে এই কর্ত্তৃত্ব জ্ঞান হইতে বঞ্চিত করিতে পারে না। আমাদের কর্ত্তৃত্ব ভার আমরা আপনাপনিই বুঝিতে পারি —আমাদের অন্তরাত্মাই, ইহার প্রমাণ স্থল। প্রত্যেক ধর্ম্ম কালে আমাদের ত্যাগ যত অধিক হয়—আমাদের ধর্ম্ম-বল-যত প্রকাশ পায়; আমাদের স্বাধীনতা ও কর্ত্তৃত্ব আমরা ততই বুঝিতে পারি। বিবয়াকর্ষণের প্রতিকূলে আমাদের ইচ্ছাকে যে পরিমাণে নিয়োগ করি, সেই পরিমাণে বুঝিতে পারি যে আমি বিষয় ইইতে স্বতন্ত্র। এই প্রকার কর্ত্তৃত্ব জ্ঞান এবং কর্ত্তব্য জ্ঞান ধর্ম্মের এক প্রধান পুরস্কার এবং পরকালের প্রধান প্রমাণ স্থল। একবার কুপ্রবৃত্তির প্রতিস্রোতে গিয়া কে না আপনার স্বাধীনতা উপলব্ধি করিয়াছে? স্বার্থপরতাকে বিসর্জ্জন দিয়া কে না আপনাকে এ পৃথিবীর অনুপযুক্ত এবং শ্রেষ্ঠ লোকের উপযুক্ত বোধ করিয়াছে? একটি স্বাধীন স্বতন্ত্র কার্য্য আপনার কর্ত্তৃত্ব ও স্বাধীনতাকে যেমন ব্যক্ত করে, শত শত যুক্তিতে তেমন করিতে পারে না। একটি কষ্টসাধ্য ধর্ম্ম-কার্য্য বিপক্ষবাদীদিগের যুক্তি খণ্ডনের অতি তীক্ষ্ণ, অস্ত্র। আমরা এখানে পরকালের আভাস কিছু মাত্র না পাইলে আর তাহাতে দৃঢ় বিশ্বাস হইত না। আমরা এখানেই মুক্ত ভাব উপলব্ধি না করিলে মুক্তির বিষয় কিছুই বুঝিতে পারিতাম না। এখানে আমরা বিষয়াকর্ষণকে যতবার নিরস্ত করিব; মুক্তভাব যত উপলব্ধি করিব; পরকাল ততই মনে জাগ্রহ হইয়া উঠিবে।

যখন দেখিতে পাই—বিষয় স্রোতের প্রতিস্রোতেই অনেক সময় গমন করিতে হয়—ইন্দ্রিয় সুখকে বিসর্জ্জন দিতে হয়—ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়; প্রবৃত্তির

সহিত সংগ্রাম করিতে হয়; অথচ সেই সকল কার্য্যের পৃথিবীর সঙ্গে তাদৃশ যোগ নাই —তাহাতে সংসারেরও উন্নতি হয় না—ধন মানও উপার্জ্জন হয় না—স্বার্থপরতাও তৃপ্ত হয় না; তখন ইহাই প্রতীতি হয় যে আমি কেবল এই পৃথিবী লোকেরই জীব নহি, শ্রেষ্ঠ লোকের উপযুক্ত জ্ঞান ও ধর্ম্ম শিক্ষার জন্য এই পৃথিবীতে কিছুকাল অবস্থিতি করিতেছি। পশুদিগের তো এমন একটি অঙ্গ নাই, এমন একটি প্রবৃত্তি মাই, এমন কিছুই নাই, যাহা ইহকালের সম্যক্ উপযোগী না হইয়াছে মনুষ্যেরই এরূপ কেন? জন সমাজের শৃঙ্খলা রক্ষার নিমিত্তে আরো নানা উপায় হইতে পারিত—পরমেশ্বর মনুষ্যকে পশুদিগের ন্যায় কেবল প্রবৃত্তির বশীভূত করিতে পারিতেন; তিনি তাহার স্বার্থপরতাকে আরো দূরদর্শী করিয়া জনসমাজের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিতেন। কিন্তু মানুষ্য কেবল ইহকালের জীব নহে বলিয়া জগদীশ্বর এরূপ বিধান করেন নাই। ধর্ম্মের নিঃস্বার্থ ভাব পৃথিবীর ভাব হইতে অতি উচ্চ—সংসারের ক্ষুদ্র বিষয় সকলের একান্ত অনুপযোগী। মনুষ্য ধর্ম্মের সহিত নিষ্কাম মিত্রতা বন্ধন করিলে আপনার বৈষয়িক ক্ষতি বৃদ্ধির আশা ভয়ে বিশেষ ব্যাকুল হয়েন না, ধর্মানুষ্ঠানেই আপনাকে পবিত্র করিয়া পৃথিবী হইতেই উচ্চতর ধামের উপযুক্ত করেন। এখান হইতে আমরা পরকালের আভাস প্রাপ্ত হইতেছি। আমরা জীবদ্দশাতেই ধর্ম্মের অনুরোধে বিষয়ের প্রতিকূলে গিয়া মুক্তাবস্থা কতক উপলব্ধি করিতে পারিতেছি। ঈশ্বরের সহিত এখানে আমাদের যোগ হইলে পরকালের বিশ্বাস আরো অটল হয়। ঈশ্বরের সঙ্গে এখানে একবার সম্বন্ধ নিবদ্ধ করিলে আর কেহই সে বিশ্বাসকে খণ্ডন করিতে পারে না। এই অখণ্ড বিশ্বাসের উপরে নির্ভর করিয়াই প্রাচীন ঋষিরা বলিয়া গিয়াছেন, ‘যএতদ্বিদুরমৃতান্তে ভবন্তি’ ‘যাঁহারা ইঁহাকে জানেন, তাঁহারা অমর হয়েন।’ ঈশ্বরের সহিত আমাদের চিরন্তন সম্বন্ধ—সে সম্বন্ধ একবার নিবদ্ধ হইলে আর কোন কালেই তাহা নিরাকৃত হইবার নহে। আমরা ঈশ্বরের আশ্রয়ে চিরকালই অবস্থিতি করিব; এই দৃঢ় বিশ্বাস তাপেক্ষা পরকালের দৃঢ়তর প্রমাণ আর কিছুই নাই। শুদ্ধ তর্ক-তরঙ্গের উপরে পরকালের বিশ্বাস নির্ম্মাণ করা কোন কার্য্যেরই নহে। বিপক্ষেরা তকের বলে ইহা কদাপি প্রমাণ করিতে পারেন না, যে জীবাত্মার বিনাশ বা ভঙ্গ হইবে। আমরা বরং উপমিতি দ্বারা প্রাপ্ত হইতেছি, যে জীবের বিনাশও নাই ভঙ্গও নাই। কিন্তু এই সকল তর্কের আড়ম্বরীতে আপনার বুদ্ধিকেই চরিতার্থ করা হয়। আত্ম-প্রত্যয়ে নির্ভর ব্যতীত কেবল বুদ্ধির সিদ্ধান্তে মনের নিষ্ঠা হয় না। আপনাকে ভুলিয়া বিষয়-স্রোতেই ভাসিতে থাকিলে সে প্রত্যয়টি উৎপন্ন হইতে পারে না; ধর্ম্ম ও ঈশ্বরের সহিত যোগ না হইলে সে প্রত্যয় দৃঢ়ীভূত হয় না। অস্থায়ী বিষয়-লালসাতে নিরন্তর বিক্ষিপ্ত থাকিলে অনন্ত কালের প্রতি একবারও দৃষ্টিপাত হয় না। যাহার সহিত আমাদের চির সম্বন্ধ, যিনি আমাদের ইহকাল ও পরকালের একমাত্র উপজীব্য; তাঁহাকে এখানেই লাভ করিলে পরকালের বিষয়ে আর সংশয় থাকিতে পারে না। তাহা হইলে আমাদের এই অটল বিশ্বাস হয় যে তাঁহার আশ্রয় হইতে আমরা কোন কালেই বঞ্চিত হইব না—তাঁহার সহিত সম্বন্ধ

কখনই ভঙ্গ হইবে না —তিনি আমাদের জ্ঞান-নেত্র হইতে আর কখনই অন্তরিত হইবেন না। তিনি অনন্ত কাল পর্যন্ত আমাদের স্পৃহাকে তৃপ্ত করিবেন-আশাকে পূর্ণ করিবেন—আত্মাকে শীতল করিবেন এবং স্বয়ং আপনাকে প্রদান করিয়া আমাদিগকে পরিপোষণ করিবেন। এই অটল বিশ্বাসই পরকালের দেদীপ্যমান প্রমাণ।

অষ্টম উপদেশ।

স্বর্গ ও নরক।

স্বর্গ নরকের ভব কিছু না কিছু সকল ধর্ম্মেতেই পাওয়া যায়। যেখানে পাপ পুণ্যের কথা কিছু আছে—যে ধর্ম্মে কর্ত্তব্যের ভাব কিছু মাত্র পরিস্ফুটিত হইয়াছে; সেখানে স্বর্গ নরকের কোন না কোন প্রকার প্রসঙ্গ অবশ্যই পাওয়া যায়। সকল ধর্ম্মেতেই পাপ-লোক দুঃখময় এবং পুণ্যলোক সুখের ধাম বলিয়া বর্ণনা আছে। সকল ধর্ম্মেরই এই উপদেশ যে পরম ন্যায়বান্ পরমেশ্বর পরলোকে পাপ পুণ্যের ফলাফল ন্যায্য রূপে বিধান করিবেন। আমরা সহজ জ্ঞানে যাহা পাইতেছি, ব্রাহ্মধর্ম্মে সংক্ষেপের মধ্যে তাহার সকলই আছে। "পূণ্যং কুর্ব্বন্ পুণ্যকীর্ত্তিঃ পুণ্যং স্থানং স্ম গচ্ছতি। পাপং কুর্ব্বন্ পাপকীর্ত্তিঃ পাপমেবাশ্নুতে ফলং।" কিন্তু সেই পুণ্যফল আর পাপফল বিশেষ করিয়া বলিতে গিয়াই নানা ভ্রমের উৎপত্তি হইয়াছে। ধর্ম্মেতেই মুখ এবং পাপেতেই দুঃখ, এই আমরা সহজ জ্ঞানে জনিয়েছি। কিন্তু যেখানে সেই সুখের ভাব ও দুঃখের ভাব সবিশেষ বর্ণন করা হইয়াছে, সেখানে সত্যের পরিবর্ত্তে কল্পনাই স্থান পাইতেছে। ধর্ম্মের সঙ্গে সুখের কি প্রকার আর পাপের সঙ্গেও দুঃখেরই বা কি প্রকার সম্বন্ধ, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিলেই স্বর্গ নরকের ভাব অনেক বুঝা যাইবে।

সুখ কি? আমাদের সমুদয় বৃত্তির চরিতার্থতাতেই সুখ। আমাদের কোন এক বৃত্তি নিদ্রিত থাকিলে সুখের একটি দ্বার রুদ্ধ হইল। মনুষ্যের ইন্দ্রিয়-প্রবৃত্তি-সকল বাহ্য বিষয়ের প্রতি উন্মুখ রহিয়াছে, তাঁহার মানস-রসনা সৌন্দর্য্য রসপান করিবার জন্য উৎসুক রহিয়াছে, তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি সকল জ্ঞান এবং সত্যের দিকেই প্রসারিত হইতেছে, তাঁহার হৃদয় প্রেম-ক্ষুধা শান্তির নিমিত্তে নিয়ত ব্যাকুলিত হইতেছে, তাঁহার ধর্ম্ম-প্রকৃতি শ্রেয়কে অবলম্বন করিয়াই চরিতার্থ হইতেছে এবং তজ্জনিত বিমল আত্ম-প্রসাদেই পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইতেছে, তাঁহার ঈশ্বর-স্পৃহা বিষয়ের স্থূল আবরণ ছেদ করিয়া অদৃশ্য অলক্ষ্য বিষয়া— তীত ঈশ্বরকে

পাইয়া চরিতার্থ হইতেছে। মনুষ্য যদি সম্পূর্ণ রূপে সুখী হইতে চাহেন, তবে তাঁহার জন্য অর্থ, জ্ঞান, প্রেম, ধর্ম্ম, ঈশ্বর, এ সকলই আবশ্যক। আমাদের কোন এক বৃত্তি কোন এক ইচ্ছা অসম্পন্ন থাকিলে তজ্জনিত সুখ হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। আমাদের সুখ যখন এমত বিভিন্ন প্রকার, তখন ইহা স্পষ্টই রহিয়াছে, যে এসমুদায় সুখ এক কালে উপভোগ করা আমাদের সাধ্য হয় না। ইন্দ্রিয় লোলুপ ব্যক্তি বুদ্ধি জনিত ও ধর্ম্ম-জনিত সুখভোগে সমর্থ হয় না। ধার্মিক ব্যক্তির অনেক সময় বিষয় সুখে বঞ্চিত হইতে হয়। আমাদের হৃদয়ে কোন দুঃসহ পরিতাপ উপস্থিত হইলে ইন্দ্রিয়-সুখ বিজ্ঞানসুখ ইহার কিছুই আস্বাদন করিতে পারি না এবং ইহাও দেখা গিয়াছে যে ধর্ম্ম-যোদ্ধাগণ ধর্ম্ম-বর্ম্মে আবৃত থাকিয়া বিপক্ষদিগের সহস্র প্রকার অত্যাচারকে তুচ্ছ করিয়াছে। তাহাদের আত্মার শান্তি কেহই হরণ করিতে পারে নাই। "প্রসাদে সর্ব্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে।" ইহা হইতে আমরা এক নিয়ম এই পাইতেছি, যে যহৎ এবং পবিত্র সুখ উপভোগ করিতে হইলে নিকৃষ্ট সুখকে অনেক সময় পরিত্যাগ করিতে হইবে। বিষয়ের সঙ্গে যেমন আমাদের বিষয়-সুখ, ধর্ম্মের সঙ্গে সেই রূপ আত্ম-প্রসাদ এবং ঈশ্বরের সঙ্গে ব্রহ্মানন্দের উপভোগ হয়। এই ধর্ম্ম-জনিত আত্ম-প্রসাদ এবং ঈশ্বরের সহবাস জনিত ব্রহ্মানন্দ আমাদের চিরজীবনের সম্বল। বিষয়ের যোগে যে সুখ, তাহা বিষয়ের বিচ্ছেদেই চলিয়া যাইবে; কিন্তু ধর্মের আনন্দ ও ব্রহ্মানন্দ আমাদের অক্ষয়ধন। মনুষ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ধর্ম্ম-প্রকৃতি ক্রমিকই প্রশস্ত ও উন্নত হইতে থাকিবে এবং তজ্জনিত আনন্দ আরো অধিক হইতে থাকিবে। যৌবন কালে যেমন নূতন নূতন সুখের প্রস্রবণ প্রমুক্ত হইয়া শৈশব-কালের সুখ সমুদায়কে অতিক্রম করে; আত্মার উন্নতাবস্থাতেও সেই রূপ জ্ঞান, ধর্ম্ম, ঈশ্বরপ্রীতি, এই সকল হইতেই আনন্দ ধারা নিঃসৃত হইয়া নিকৃষ্ট সুখ সমুদয়কে অতিক্রম করিয়া উঠিবে।

ধর্ম্মের সঙ্গে আত্ম-প্রসাদের সঙ্গেই বিশেষ যোগ, বিষয়-সুখের সঙ্গে সে প্রকার নাই। আমাদের আস্বাদন না থাকিলে যেমন আহারের বিচার থাকিত না, সেই রূপ আত্ম-প্রসাদ না থাকিলে আমরা ধর্ম্মের মাধুর্য্য গ্রহণ করিতে পারিতাম না; সুতরাং অনেক স্থলে ধর্ম্মানুষ্ঠানের বিশেষ ব্যাঘাত জন্মিত। আমরা নিস্বার্থভাবে ধর্ম্ম-কার্য্য সাধন করিলেই ঈশ্বর আমাদের আত্মাতে আত্ম-প্রসাদ প্রেরণ করেন। বিষয়-সুখ যদিও অনেক সময় ধর্মের বিরোধী হয়; কিন্তু আত্ম-প্রসাদ বিশ্বাসী অনুচরের ন্যায় তাহার সঙ্গে থাকিয়া আমাদিগকে ধর্ম্ম-কার্য্যে আরো উৎসাহ দিতে থাকে, বিষয়-মুখ ধর্ম্মের নিয়ত সঙ্গী নহে! ধর্ম্মকেই সাধন করিতেই হইবে; তাহার আনুষঙ্গিক বিষয়-সুখ পাওয়া যার ভালই, না যায় তাহাতেই বা কি? আমাদের সকল বৃত্তির চরিতার্থতাতেই সুখ, তাহাদের মধ্যে ধর্ম্মের বিরোধী সুখকে পরিত্যাগ করতে ধর্ম্ম। ধর্ম্মকে রক্ষা করিতে হইলে বিষয়-সুখ অনেক সময় বিসর্জ্জন করিতে হইবে, কষ্টকে আদর পূর্ব্বক গ্রহণ করিতে

হইবে। আমাদের যৌবন কালে সকল প্রবৃত্তিই সমুন্নত হয়। এই সময়ে আমাদের আমোদ-স্পৃহা, লোকানুরাগ, বিষয়-লালসা, সকলই প্রবল হইয়া উঠে। এই কলেই আমাদের ইচ্ছার সঙ্গে ধর্ম্মের সঙ্গে সর্ব্বদা বিরোধ উপস্থিত হয়। মনের ইচ্ছাকে চরিতার্থ করিলেই তাহাতে আমাদের সুখ; ধর্ম্মের অদেশে সেই সুখকে বিসর্জ্জন করিলে আত্ম-প্রসাদ থাকে। ধর্ম্মকে রক্ষা করিতে গেলে অনেক সময় বিষয়-সুখকে পরিত্যাগ করিতে হইবে; কিন্তু তাহাতে ধর্ম্ম-জনিত আনন্দ আরো অধিক উজ্জ্বল হইতে থাকিবে। নিঃস্বার্থ ধর্ম্ম কার্য্যের ফল আত্ম-প্রসাদ; ইন্দ্রিয়-মুখ ধর্ম্মের নিকট হইতে প্রার্থনা করা বৃথা।

সুখ এবং আত্ম-প্রসাদ এই দুয়ের মধ্যে প্রভেদ নির্দ্দেশ করলে অনেক ভ্রম দূর হইতে পারে। কেহ কেহ বলেন, ঈশ্বরের রাজ্যে বিচার নাই; ধার্ম্মিকেরাই অধিক দুঃখী, পাপীরাই এ সংসারে সুখে আছে। হিতৈষণা, ন্যায়, সত্য অবলম্বন করিতে গেলেই ধনমান মর্য্যাদার হানি উপস্থিত হয়। অতএব সংসারে সুখে থাকিতে গেলে ধর্ম্ম রক্ষা কোন ক্রমেই হয় না।

আমরা ধার্ম্মিক হইলে সংসারের সকল সুখ সম্পদ ভোগ করতে পাইব, ঈশ্বর আমাদের মঙ্গলের জন্যই এ রূপ বিধান করেন নাই। তিনি আমাদের সুখ তত চাহেন না, যত আমাদের ধর্ম্ম চাহেন। যদি ধার্মিক হইবামাত্র আমাদের সমুদায় কামনা চরিতার্থ হইত, তবে ধর্ম্মের কোন মূল্য, কোন বলই থাকিত না। ধর্ম্মের এ প্রকার উদার ভাব যে আমরা যদি সুখ উদ্দেশ করিয়া ধর্ম্ম সাধন করি, তবে তাহার পবিত্রতার হানি হয়। ত্যাগই ধর্ম্মের প্রাণ-স্বরূপ: কিন্তু আমরা যদি ভাবি লাভের উদ্দেশে ত্যাগ আপাততঃ স্বীকার করি, তবে ধর্ম্মতঃ সে ত্যাগই নহে। ধর্ম্মের জন্য সম্যক ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে। ধর্ম্মকে ধর্মের জন্যই আলিঙ্গন করিতে হইবে। আমরা যদি ভাবি সুখের প্রত্যাশায় বর্ত্তমান সুখ পরিত্যাগ করি, তবে তাহা ধর্ম্ম-সাধন হইল না, স্বার্থ সাধন মাত্র। ধর্ম্মের দেশ বলিয়াই কার্য্য করিতে হইবে; তাহাতে অন্য কোন গুপ্ত অভিসন্ধি থাকিলে হইবে না। এ স্থলে বিষয়-সুখের সঙ্গে ধর্ম্মের সঙ্গে কেমন বিরোধ; আমাদের সম্পর্ণ লোভ-শূন্য হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হইবে। তবে ঈশ্বর যদি তাহার পুরস্কার দেন; তিনি যদি আমাদের কষ্টের শতগুণ সুখ আমাদের জন্য সঞ্চিত করিয়া রাখেন; তবে ইহাতে তাঁহার কৃপা ভিন্ন আর কিছুই নাই, ইহাতে আমাদের নিঃস্বার্থ ভাবের কোন হানি হইল না।

বিষয়-সুখের সঙ্গে ধর্ম্মের বিরোধ থাকাতেই ধর্ম্মের যথার্থ মাহাত্ম্য প্রকাশ পাইতেছে। আমাদের যা ইচ্ছা, তাহাই যদি ধর্ম্ম হইত; আমাদের স্বেচ্ছাচার তার কর্ত্তব্যে যদি কোন প্রভেদ না থাকিত; তবে ধর্ম্ম-কার্য্যের মূল্য কি থাকিত? আমরা, আপনা হইতে ধর্ম্ম পথে যাই ঈশ্বরের ইচ্ছা এই; এবং এই হেতু তিনি আমাদিগকে

স্বাধীন করিয়া দিয়াছেন। আমাদের সম্মুখে সৎপথ অসৎ পথ দুইই রহিয়াছে এবং এই দুয়ের মধ্যে যাহা ইচ্ছা আমরা বাছিয়া লইতে পারি, এই কর্ত্তৃত্ব ভারও রহিয়াছে। যখন ইচ্ছা পূর্ব্বক সৎকে অবলম্বন করাতেই ধর্ম্ম, তখন যদি ধর্ম্মের বিরোধী ইচ্ছা আমাদের কিছুই না থাকিত, তাহা হইলে আমাদের ধর্ম্মের উপার্জন কি হইত? সংসারের কোন প্রলোভনই যদি আমাদিগকে ধর্ম্ম-পথ হইতে আকর্ষণ করিবার জন্য আমাদের সম্মুখে না আসিত, তবে ধর্ম্ম রক্ষার গৌরব কি থাকিত? যাই ধর্ম্মের বিরোধী বিষয়সকল আমাদিগকে আকর্ষণ করিতেছে, খাই আমরা বল পুর্ব্বক সেই সকল বিষয়ের প্রতিশ্রোতে যাইতেছি; তাহাতেই আমরা ধর্ম্মের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতেছি। ঈশ্বর যদি কেবল আমাদিগকে সুখী করিবার ইচ্ছা করিতেন, তবে ধর্ম্ম না দিয়াও সুখী করিতে পারিতেন। কিন্তু যখন তাঁহার শুভ অভিপ্রায় এই যে আমরা ধর্ম্ম-বল উপার্জ্জন করিয়া তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইতে থাকি, তখন আমাদের লক্ষ্য কি বিষয়-সুখ হওয়া উচিত? না ধর্ম্মের জন্য বিষয়সুখের হানিকে হানি বোধ করা উচিত?

আমরা এখানে দুই প্রকার অবস্থা দেখিতে পাই। অনেক স্থলে ধর্ম্মের সঙ্গে আমাদের বিরোধ থাকে, অনেক হলে নির্ব্বিরোধ। এক আমাদের নির্দ্দোষাবস্থা; অন্য আমাদের উন্নতি কিম্বা দুর্গতির অবস্থা। আমাদের প্রবৃত্তির সঙ্গে অনেক স্থলে ধর্ম্মের ঐক্য দেখা যায়। শরীর রক্ষা তামাদের পরম ধর্ম্ম; কিন্তু আমরা প্রবৃত্তি বশতও শরীর সেবায় প্রবৃত্ত হইতেছি। অশন বসন সুখ-স্বাচ্ছন্দতা পাইবার নিমিত্তে লোকে যে এত কষ্ট সহ্য করিতেছে, ধর্ম্মতঃ বিবেচনা করিতে গেলে তাহাতে তাহাদের কিছু মাত্র গৌরব নাই। কিন্তু যদি আমাদের এমন এক সময় উপস্থিত হয়, যখন আমরা বিপদে একান্ত আক্রান্ত হই— শোকেতে ব্যাকুল মতি হই—আপনার প্রতি আর কিছু মাত্র আদর থাকে না; মৃত্যুই আমাদের প্রার্থনীয় হইয়া পড়ে। এমন অবস্থায় যদি আমরা আমাদের সমুদয় বল একত্র করিয়া কেবল ধর্ম্মের জন্য কর্তব্যের জন্য আত্ম রক্ষা করি; সেই স্থলেই আমাদের ধর্ম্ম-বল প্রকাশ পায়। এই প্রকার আমরা ধর্ম্ম হইতে হিতৈষণার আদেশ পাইতেছি এবং আমাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হইতেও অন্যের প্রতি প্রেম দয়া, করুণা বিস্তার করিতেছি। কিন্তু মাতা যে তাঁহার পুত্রকে স্নেহ করেন, স্বামী যে তাহার স্ত্রীকে প্রীতি করেন, দরিদ্রের দুঃখ দেখিয়া যে কোন ব্যক্তি দয়া অনুভব করেন; তাহাতে তাঁহারদিগের ধর্ম্ম-গৌরব কি? সংগ্রাম স্থলেই ধর্ম্মের মাহাত্ম্য প্রকাশ পায়। আমরা যখন আপনার সুখ স্বচ্ছন্দতা বিসর্জ্জন করিয়া নিরাহারী নিরাশ্রয়কে অন্ন বস্ত্র প্রদান করি—যখন আমরা সমুদয় কষ্ট সহ্য করিয়া সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা সহকারে আমাদের কোন চির পালিত মন্দ অভ্যাসকে পরিত্যাগ করি-যখন শত্রুকে প্রেম দ্বারা পরাজয় করি, অসাধুকে সাধুতাতে ক্রয় করি—যখন ধর্ম্মের জন্য প্রাণের আশঙ্কও পরিত্যাগ করি; তখনই আমাদের প্রকৃত মহত্ত্ব; তখনই আমাদের কর্ত্তৃত্ব প্রকাশ পায়; তখনই আত্মাতে আত্ম-প্রসাদ অবতীর্ণ হয়। আত্মার বল বীর্য্য এই

প্রকারেই উপার্জ্জন হয়। এই সকল সংগ্রাম স্থলেই আমাদের পরীক্ষা ও শিক্ষা হয়। এই হেতু ঈশ্বর আমাদিগকে সংসারে চির দিন সুখের ক্রোড়ে শয়ান রাখেন নাই। তিনি আমাদিগকে নানা কঠোর অবস্থাতে নিক্ষেপ করিয়া আমাদিগকে শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। দেব-ভাব, পশু-ভাব—কুপ্রবৃত্তি, সুপ্রবৃত্তির সংগ্রামে আমরা ধর্ম্মবল উপার্জ্জন করি।

যাহারা স্বর্গকে বিষয়-সুখের ধাম বলিয়া বর্ণনা করে, তাহাদের ভ্রম এস্থানে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। এখানে আত্মপ্রসাদই স্বর্গের পূর্ব্বাভাস; কিন্তু তাহারদিগের মতে সেই স্বর্গেতে বিষয়-সুখই রাশীকৃত সঞ্চিত হইয়াছে। যে সকল কামনা এই মর্ত্যলোকে দুর্লভ, তাহাই সেখানে পূর্ণ হইবে। "সরথা সতূর্য্যা অপ্সরা, মহদায়তন সুগন্ধ কানন, সুশীতল অবিরল ছায়া, বিস্তীর্ণ বিমলা নদী, এই সকল স্বর্গলোকে প্রচুর-রূপে পাওয়া যাইবে। এই সমুদয় প্রাপ্ত হওয়া আমাদের সমুদায় ধর্ম্ম-কার্য্যের শেষ ফল! এখানে কিঞ্চিৎ ত্যাগ স্বীকার করিতে পারিলে স্বর্গলোকে আমরা অশ্ব রথ গজে পরিবৃত হইব। এখানে কামোপভোগ হইতে বিরত হইলে স্বর্গলোকে উৎকৃষ্ট সুরা, অপ্সরা, মর্ত্যলোকের দুর্ল্লভ ভোগ-সকল লাভ হইবে। স্বর্গের এই প্রকার ভাব কি হীন ভাব! ইহাতে আমাদের তাত্মা কখনই সায় দেয় না।

বিষয়-সুখই কি আমাদের পরম পুরুষার্থ? আমাদের সমুদায় ধর্ম্ম-কার্য্যের শেষ কল কি অকিঞ্চিৎকর বিষয়-সুখ? আমাদের সমুদায় আশা ভরশা কি এই প্রকার সুখেতে পর্য্যবসান হইতে পারে? ইহা অপেক্ষা উন্নত উদ্ধত পবিত্র ফল কি আর কিছুই নাই? হে ভদ্র! হে বিদ্বন! তুমি কি মনে কর, তোমাকেই আমি জিজ্ঞাসা করি। মনে কর, এখানে তোমার সকল ইচ্ছা চরিতার্থ হইয়াছে, তুমি এখানকার সকল কামনার কামভাগী হইয়াছ, পার্থিব সুখের কোন অভাব নাই; ধন, মান, যশ, প্রভুত্ব, অপর্য্যাপ্ত রূপে ভোগ করিতেছ; এই কি তোমার পরম প্রার্থনীয় অবস্থা? এই অবস্থাতেই কি তুমি চিরকাল পরিতৃপ্ত থাকিতে পার? এই সুখ-প্রদর্শন যদি অনন্ত কাল পর্য্যন্ত তোমার সম্মুখে বিস্তৃত থাকে, তাহাতেই কি তুমি আপনাকে কৃতার্থ বোধ কর? না তোমার আত্মা ইহা অপেক্ষা মহত্ত্বর উচ্চতর বিষয় চায়? মনুষ্যের আত্মা এই সকল প্রশ্নে এই একই উত্তর দেয়, যে আত্মার যে স্পৃহা ও আশা, বিষয়-সুখে তাহার কিছুই পূর্ণ হয় না।

সহস্র সহস্র ইন্দ্রিয়-সুখ, সহস্র সহস্র কৃত্রিম শোভায়। অনুরঞ্জিত হইলেও আমাদের আত্মাকে পূর্ণ ও পরিতৃপ্ত করিতে পারে না। নির্দ্দোষ ইন্দ্রিয়-সুখ অবশ্য সেব্য, তাহার সন্দেহ নাই। শোভা সঙ্গীত সৌগন্ধে পরিবৃত মনোহর উদ্যান বা উন্নত প্রাসাদে বাস করা—যে সকল স্থানে কর্ণ কোন অশ্রাব্য সুর শুনিতে পায় না, চক্ষু কোন কুৎসিত রূপ দেখিতে পায় না, এমন সকল স্থানে কালক্ষেপ করা—নানাবিধ ভোগ্য সামগ্রীতে আমাদের পশুপ্রকৃতিকে চরিতার্থ করা; এ সকল সামান্য সুখ

নহে। পণ্ডিতভিমানী ব্যক্তিরা যাহা বলুন না কেন, এ সকল সুখ কখনই হেয় নহে! জগদীশ্বর আমাদের জন্য এ প্রকার সুখ অপর্যাপ্ত রূপে বিস্তার করিয়া রাখিয়াছেন। আমাদের চক্ষু কর্ণ পবিত্র সুখের দুই বিস্তীর্ণ দ্বার। কিন্তু এই প্রকার ইন্দ্রিয়-সুখই আমাদের সর্বস্ব নহে। ইহাতেই আমাদের সমুদয় প্রকৃতি চরিতার্থ হয় না। আমরা ইহা অপেক্ষাও আরো অধিক কিছু চাই। ইন্দ্রিয়-লোলুপ ব্যক্তি এ প্রকার সুখে সম্যক্ পরিতৃপ্ত থাকিতে পারে না। যৌবন কাল অতিক্রম করিয়া ইহা বিলক্ষণ অনুভব করা যায়। আমরা যৌবন কালে যত অপর্য্যাপ্ত রূপে সুখভোগ করি, পরে তত শীঘ্র তাহাতে বিরক্তি জমে। যাহারা সে সময়ে পরিমিত রূপে সুখ ভোগ করে, পরে আর তাহাতে তেমন স্পৃহা থাকে না। আমাদের জীবনের এমন এক সময় উপস্থিত হয়, যখন আমাদের সাংসারিক সমুদয় ভাব শীতল হুইয়া যায় এবং সংসারকেই যাহারা সার্ব্বস্ব জানিয়া সেবা করিয়া আসিয়াছে, তাহারাও বুঝিতে পারে যে সেই সংসারও তাহাদের শূন্য হৃদয়কে পূর্ণ করিতে পারে নাই।

অতএব স্বর্গকে এই প্রকার বিষয়-সুখের আলয় বলিয়া বর্ণন করা কি মূঢ়ত্বের কর্ম্ম! বিষয়-সুখে আমাদের আত্মা তৃপ্ত হয় না, এই আমাদের পরম মঙ্গল। তবে সেই সুখই কি আমাদের জীবনের শেষ লক্ষ্য, সমুদায় কর্ম্মের শেষ ফল হইবে?

পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে যে আমাদের নিঃস্বার্থ ভাবে লোভ-শূন্য হইয়া ধর্ম্মের তানুষ্ঠান করিতে হইবে। আমরা স্বর্গের লোভে ধর্ম্মেতে অনুরক্ত হই, নরকের ভয়ে পাপ হইতে বিরত হই, ধর্ম্ম-জীবি জীবের ভাব এ প্রকার হওয়া উচিত নহে। যে ঈশ্বর আমাদের নিষ্কাম প্রীতি চাহেন, তাঁহা হইতেই আমরা নিঃস্বার্থ ধর্ম্মের শিক্ষা পাইতেছি। ঈশ্বর ধর্ম্মকে ধর্ম্মের জন্য আলিঙ্গন করিতে আমারদিগকে শিক্ষা দিতেছেন। আমরা লাভ ক্ষতি ফলাফল বিবেচনা করিয়া ধর্ম্মে প্রবৃত্ত হই, তাঁহার শিক্ষা এ প্রকার নয়। আমাদের নিস্বার্থ ভাব দেখিলে তবে তিনি প্রসন্ন হইয়া আমাদিগকে পুরস্কার দেন এবং তিনি নিজেই তাহার পুরস্কার হয়েন।

মনুষ্যকে যাহার লোভ দেখাইয়া ধর্ম্মে আনিতে চাহে অথবা ভয় দেখাইয়া পাপ হইতে বিরত করিতে চাহে; তাহারা ধর্ম্মের প্রকৃত ভাব অবগত নহে।

ঈশ্বর আমারদিগকে ভবিষ্যতে দণ্ড পুরস্কার দিবার জন্যই এখানে প্রেরণ করেন নাই। তিনি আমাদিগের জন্য একদিকে স্বর্গ আর একদিকে নরক সৃষ্টি করিয়া আমারদিগকে তাহার মধ্য স্থল এই পৃথিবীতে নিক্ষেপ করিয়া রাখেন নাই, যে মৃত্যুর পরে হুয় অনন্ত স্বর্গ-ভোগ বা অনন্ত নরক-ভোগ হইবে। আত্মার উৎকর্ষ সাধনই তাঁহার উদ্দেশ্য। এ পৃথিবীতেই আমাদের শিক্ষার শেষ হইবে না। আমরা সহজ জ্ঞানে এই বুঝিতে পারি যে ঈশ্বর "ধর্ম্মাবহং পাপমুদং।" ধর্ম্মের আবহ এবং

পাপের মোচয়িতা। পাপীর দণ্ড অবশ্যই হইবে। ন্যায়বান্ ঈশ্বর পাপের উপযুক্ত দণ্ড অবশ্যই বিধান করিবেন; দণ্ডের জন্যই তাঁহার দণ্ড দিবার তাৎপর্য্য নহে কিন্তু পাপীর পরিত্রাণের জন্য। সেই প্রকার ঈশ্বর অবশ্য ধর্ম্মের পুরস্কার দিবেন। কিন্তু পুরস্কারের জন্য আমাদের ধর্ম্ম নহে। আমরা কি প্রত্যাশাপন্ন হইয়া ধর্ম্ম সাধন করিব? কখনই না। ঈশ্বর সুখকে আমাদের পরম পুরস্কার করিয়া রাখেন নাই; কিন্তু সুখ আমাদের অন্ন স্বরূপ; সেই অন্নে আমরা বল পাইয়া আরো প্রকৃষ্ট রূপে ধর্ম্ম সাধন করিতে পারি, এই তাহার অভিপ্রায়। আমরা ধর্ম্ম সাধন করিয়া ধর্ম্ম-বল উপার্জ্জন করিলাম; ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী হইলাম; এই আমাদের পুরস্কার; ইহা অপেক্ষা আর অধিক কি চাই? আমরা পাপ-কলঙ্ক হইতে মুক্ত হইয়া, সত্যতা পবিত্রতা অর্জন করিয়া, পুণ্য সঞ্চয় করিয়া, স্বাধীনতা উপার্জ্জন করিয়া, পরিশেষে এক আমাদের লক্ষ্য এই হইল যে স্বর্গে গিয়া একটুকু সুখ ভোগ করিব? ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিয়া আমাদের লক্ষ্য ঈশ্বরের দিকেই যায়। আমরা ধর্ম্ম সাধন করিয়া সেই পবিত্র-স্বরূপকে পাইবার অধিকারী হই।

সংসারিক সুখ-ভোগের জন্য ধর্ম্মাচরণ যে প্রকার, স্বর্গ লাভের জন্য ধর্ম্ম-সাধনও সেই প্রকার। স্বার্থপরতা কি পরলোক পর্যন্ত বিস্তৃত হইলেই তাহা ধর্ম্মের বেশ ধারণ করিল? যদি অল্প পুরস্কারের জন্য ধর্ম্ম-সাধন প্রকৃত ধর্ম্ম না হয়, তবে অধিক পুরস্কারের জন্য যে ধর্ম্ম সেই কি পবিত্র ধর্ম্ম? এক রজত মুদ্রাতে লুব্ধ হওয়াও যাহা, এক শত মুদ্রাতেও সেই প্রকার, বরং অধিক; এবং স্বর্গ সুখ-ভোগের প্রত্যাশায়ও সেই প্রকার। এক দিবস কারাবাসের ভয়ে পাপ হইতে নিবৃত্ত হওয়াও যাহা,চতুর্দ্দশ বৎসর নির্ব্বাসের ভয়ে বিরত হওয়াও সেই প্রকার; এবং অনন্ত নরকাগ্নি ভয়েও সেই প্রকার। যে ব্যক্তি প্রত্যাশাপন্ন হইয়া ধর্ম্ম সাধন করে, সে একেবারেই বহু সম্পত্তি পাইবার মানসে আপাততঃ কিঞ্চিৎ কষ্ট সহ্য করিতে পারে; কিন্তু যিনি ধর্ম্মের জন্যই ধর্ম্ম সাধন করেন, তিনি আর মূল্যের বিষয় বিবেচনা করেন না; তাঁহার পক্ষে অল্প মূল্যও যাহা, আধিক মূল্যও সেই প্রকার।

কিন্তু স্বর্গের লোভে যেমন ধর্ম্ম হয় না, নরকের ভয় পাপীর পক্ষে কি রূপ? পাপীকে নরকের ভয় কি দেখাইবে? সে এখানে নরকের জ্বালা সহ্য করিতেছে; অথচ তাহাতে তাহার চেতন হয় না। পাপীকে অনন্ত নরক, জ্বলন্ত অনল, দুঃসহ যাতনার ভয় দেখাও, তাহাতে তাহার কি হইবে? তাহার পাপের আসক্তি কি ক্ষীণ হইবে? না, কেবল ভয়েরই সঞ্চার হইবে। ভয়েতে চালিত হওয়া অপেক্ষা আর নীচ ভাব কিছুই নাই। যে ব্যক্তি পাপের মলিনত্ব দেখিতে পাইয়াছে, তাহা হইতে বিরত হইবার ক্ষমতা বুঝিয়াছে, ঈশ্বরের অপ্রসন্নতা অনুভব করিয়াছে; অথচ যাহার পাপের প্রতি কিছু মাত্র ঘৃণা উপস্থিত হয় নাই, ঈশ্বর-প্রীতির শাখা মাত্রও যাহার হৃদয়ে উদ্দীপ্ত হয় নাই কিন্তু সে ব্যক্তি নীচ হীন পশুবৎ ভয়েতেই কখন কখন পাপ প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করিতে পারে নাই; তাহার অপরাধের কি তাহাতে কিছু মাত্র

লাঘব হইল? মন্দকে ভাল বাসিয়া গ্রহণ করতেই পাপ; তাহার সহিত ভয় মিশ্রিত হইলেই কি তাহার মলিনত্ব দূর হইল?

পাপীর শাস্তি অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। যিনি ধর্ম্ম-রাজ্যের রাজা, তিনি পাপের দণ্ড অবশ্যই বিধান করিবেন। সকল ধর্ম্মই ইহা স্বীকার করিয়া থাকে, স্বয়ং পাপীর অন্তরেই এ ভয় রাজত্ব করে। কিন্তু পাপীর নরক ভোগ কি প্রকার? আত্ম-গ্লানিই পাপীর নরক ভোগ। তাহার দুঃসহ হৃদয়-জ্বালাই নরকাগ্নি সমান। পাপীকে শাস্তি দিবার জন্য অগ্নিময় দৈত্যময় কীট পূর্ণ নরককল্পনা করিবার ভাবশ্যক করে না। তাহার আত্ম-গ্লানির দ্বার খুলিয়া দিলেই সে নরকের সমুদয় যন্ত্রণা ভোগ করিবে। পাপী ব্যক্তি এখানে আমোদ প্রমোদে আপনার অবস্থা ভুলিয়া থাকে, চির অভ্যাস বশতঃ পাপ কর্ম্মে অকাতরে রত হয়—তাহাদের শাস্তি দিবার জন্য অধিক আর কিছু আবশ্যক করিবে না, তাহাদের মন বহির্ব্বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইলেই আপনার প্রতি দৃষ্টি করিবে; তখনই সে আপনার অবস্থা বুঝিতে পারিবে; তখন তাহার সেই আত্মগ্লানির সন্ত্রণাই নরকের যন্ত্রণা। এখানে পাপীদের স্ফীত ভাব দেখিয়াই তাহারদিগকে সুখী মনে করা অতীব ভ্রান্তি। পাপের ফলই এই যে পাপীরা "দুর্ভিক্ষাৎ যান্তি দুর্ভিক্ষং ক্লেশাৎ ক্লেশং ভয়াদ্ভয়ং।"

কিন্তু এক বিষয় আমরা জানিতেছি যে পাপীর অনন্ত শাস্তি নহে। তাহার পাপ ভার যতই হউক না কেন, তাহা অবশ্যই পরিমিত। পরিমিত জীব অনন্ত পাপে পাপী কখনই হইতে পারে না। কতটুকু পাপের কি রূপ দণ্ড, তাহা যদিও আমরা ঠিক বলিতে পারি না; কিন্তু ইহা বলিতে পারি যে একটী ক্রোধ-বাক্যের জন্য প্রাণ-দণ্ড করিলে তাহা অন্যায় দণ্ড হইল। ইহা যদি সত্য হয়, তবে আমরা ইহাও বলিতে পারি; পরিমিত পাপের জন্য অনন্ত নরক ভোগ কখনই তাহার উপযুক্ত দণ্ড হইতে পারে না।

ন্যায়বান্ ঈশ্বর যেমন পাপের দণ্ড অবশ্যই দিবেন, সেই রূপ তিনি পাপিকে পোধন করিবার উপায়ও অবশ্যই বিধান করিবেন। তিনি দণ্ডের জন্যই দণ্ড দেন না, কিন্তু মঙ্গলোদ্দেশেই দণ্ড বিধান করেন। তাঁহার সকল শাস্তি ঔষধ স্বরূপ। তিনি পাপীকে একেবারে পরিত্যাগ করেন না। যে পর্য্যন্ত না পাপাত্মা তাহার পাপের জন্য অনুতাপ করিবে, যে পর্য্যন্ত না সে আপনার যথার্থ ধাম অন্বেষণ করিবে, যে পর্য্যন্ত না সে সমস্ত চিত্তে আপনার পরম পিতার প্রতি দৃষ্টি করিবে, সে পর্য্যন্ত সে শাস্তি ভোগ করিবে; এবং পরিশেষে যখন সে ঈশ্বরের আহ্বান শ্রবণ করিয়া আপনা হইতে তাঁহার দিকে গমন করিবে,তখন তিনি স্বীয় হস্ত প্রসারিত করিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিবেন এবং পুনর্ব্বার আপন রাজ্যের অধিকারী করিবেন।

পাপীর নরক ভোগ এই প্রকার, ধার্ম্মিকের স্বর্গ ভোগের আভাস আমরা এখানে কি পাইয়াছি? অন্তরেই তাহার আভাস পাইতেছি।

ব্রাহ্ম ধর্ম্মের স্বর্গ কেবল সুখের স্বর্গ নহে। ব্রাহ্ম ধর্ম্ম সুখের জন্য, ভোগের জন্য, এখানেই হউক বা পরত্রই ইউক, ধর্ম্ম সাধন করিবার শিক্ষা দেন না; কিন্তু সর্ব্বথা ইছামুত্রার্থলভোগ বিরাগেরই উপদেশ দেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম এ প্রকার কোন ঔষধ দেন না যে তাহা সেবন করিয়া পাপী একেবারেই সুস্থ হইবে; কিন্তু তিনি এই উপদেশ দেন যে অনিবার্য্য যত্ন সহকারে আমাদের কুপ্রবৃত্তি-সকলকে দমন করিতে হইবে এবং আমাদের ইচ্ছাকে ঈশ্বরের ইচ্ছার সহিত মিলিত করিতে হইবে। ব্রাহ্ম ধর্ম্ম এমত কোন স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দেন না যে সেখানে গেলেই আমাদের সকল জ্ঞান, সকল ধর্ম্ম, সকল সুখ লাভ হইবে। কিন্তু কোন কালেই আমাদের আত্মার উন্নতির বিরাম হইবে না। আমরা এক লোক হইতে অন্য উচ্চতর লোকে গিয়া উৎকৃষ্টতর অবস্থা প্রাপ্ত হইতে থাকিব। "স্বর্গাৎ স্বর্গং সুখাৎ সুখং" স্বর্গ হইতে স্বর্গ, সুখ হইতে উৎকৃষ্টতর সুখ ভোগ করিতে থাকিব—বিষয়-সুখ নয়, কিন্তু ব্রহ্মানন্দ। আমরা অনন্ত উন্নতি লাভের অধিকারী, অনন্ত-স্বরূপকে আমরা কোন কালেই জানিয়া এবং তাঁহার আনন্দ ভোগ করিয়া শেষ করিতে পারিব না, সেই অনন্ত প্রস্রবণ হইতে আমরা সকল কালেই পূর্ণ হইতে থাকিব। আমাদের কোন ভয় নাই। আমরা যেখানে থাকি, যে অবস্থায় থাকি; ঈশ্বর হইতে কখনই বিচ্ছিন্ন হইব না। আমরা জগৎ-পিতার আশ্রয়ে চিরকালই থাকিব। ধর্ম্ম উন্নত ভাব ধারণ করিবে। প্রত্যেক পাপপ্রবৃত্তি বিমর্দ্দিত হইবে এবং আমাদের দেব-তাব-সকল সমুন্নত হইতে থাকিবে। আমরা পুণ্য পদবীতে এই প্রকারে আরোহণ করিতে করিতে আমাদের পাপ-মলা সকল বিধূত হইয়া যাইবে এবং আমাদের আত্মাতে পবিত্রতা, মঙ্গল ভাব, আত্ম-প্রসাদ বহমান হইতে থাকিবে। আমাদের দেবভাবসকল আসুরিক প্রবৃত্তির উপরে জয়ী হইয়া আপনার প্রকৃত আধিপত্য সংস্থাপন করিবে।

আমাদের জ্ঞান, ভাব, ও ইচ্ছা একত্রে উন্নত হইতে থাকিবে। সেই সত্য পুরুষ আমাদের জ্ঞানের স্বর্গীয় অন্ন হইবেন; আমাদের ভাব-সকল উন্নত হইয়া তাঁহাতেই সমর্পিত হইবে; আমরা নুতন ক্ষেত্রে পতিত হইয়া ঈশ্বরের নূতন নুতন কার্য্য সমাধা করিয়া জীবনকে সার্থক করিতে থাকিব। আমরা কেবল ধ্যানে থাকির না, ব্রহ্মেতে লয় হইয়াও যাইব না; কিন্তু ধর্ম্মের পুরস্কার তাঁহার সহচর অনুচর হইয়া তাঁহার সহবাস-জনিত আনন্দ ভোগ করিতে করতেই চিরজীবন যাপন করিব। আমাদের জ্ঞান, ভাব, ও ইচ্ছা, এ তিনের একটীও বিনাশ হইবে না। কিন্তু তাহাদের ক্রমিকই উন্নতি হইতে থাকিবে। আমাদের ইচ্ছা ঈশ্বরের মঙ্গলময়ী ইচ্ছার অনুগামিনী হইবে; আমাদের প্রীতি এক্ষণে এক পরিবার, এক গ্রাম, এক দেশের

মধ্যে বন্ধ আছে, কিন্তু তখন তাহা ঈশ্বরের উদার প্রেমের রূপ ধারণ করিবে এবং আমাদের জ্ঞান বিকশিত হইয়া তাঁহাকে আরো উজ্জ্বল রূপে দেখিতে পাইবে।

আমাদের সদ্ভাব, হিতৈষণা, পবিত্রতা, উপার্জ্জন হইতে থাকিবে; আমাদের প্রত্যেক বাক্য প্রত্যেক কার্য্য হইতে ধর্ম্মামৃত নিস্যন্দিত হইবে। আমাদের প্রীতি বিস্তার হইয়া সহস্র সহস্র আত্মাকে সিক্ত করিবে। আমরা দেবতাদিগের সঙ্গে পরম পবিত্র প্রেম-ভাবে থাকিয়া ঈশ্বরের প্রিয় অভিপ্রায় সম্পাদন করিতে থাকিব। তখন আমাদের এখানকার অবস্থা স্মরণ হইলে ইহা আমাদের জীবনের শৈশবকাল মনে হইবে এবং আমাদের এখানকার সমুদায় শিক্ষা শিশুর পদ-চারণা শিক্ষার ন্যায় বোধ হইবে।

আমাদের ঈশ্বর আমাদের সমীপে জাজ্বল্যতর প্রকাশমান থাকিবেন। আমরা তাঁহার মহিমাকেই মহীয়ান করিব, তাঁহার উপাসনাতেই জীবন যাপন করিব, তাঁহার সহবাসেই পরিতৃপ্ত হইব, তাঁহার পবিত্র চরণে শ্রদ্ধা অর্পণ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ করিব, তাঁহাতে গাঢ়তর প্রীতি স্থাপন করিব এবং তাঁহার অপার প্রেম আরো উজ্জ্বল রূপে অনুভব করিতে পারিব। তিনিই আমাদের, উপজীবিকা হইবেন। যদিও চন্দ্র, সূর্য্য কখন নির্ব্বাণ হইয়। যায়, তথাপি এমন দিন অবশ্যই উদিত হইবে। এদিন একবার উদয় হইলে আর কখন অস্ত যাইবে না কিন্তু ইহার আলোক ক্রমিকই উজ্জ্বল হইয়া আমাদের আত্মাকে অনুরঞ্জিত করতে থাকিবে। ইহাই স্বর্গ, ইহাই মুক্তি।

“এষাস্য পরমা গতিরেষাস্য পরমা সম্পৎ এষোস্য পরমোলোক এষোস্য পরমআনন্দঃ।”

নবম উপদেশ।

মুক্তি।

ঈশ্বরের উপাসনা কি নিমিত্তে? যে ব্যক্তি উত্তর করে, সুখ সম্পদ পাইবার নিমিত্তে, সে বালকের ন্যায় উত্তর করে। তাহার যথার্থ লক্ষ্য স্থান এখনো হৃদয়ে আইসে নাই। এখানে সুখ দুঃখের সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তন হইতেছে। আমাদের শিক্ষার নিমিত্তে, পরীক্ষার নিমিত্তে, ঈশ্বর আমাদিগের নিকটে বিপদ প্রেরণ করিতেছেন। বিষয়-মুখ কখনই ঈশ্বরোপাসনার প্রকৃত লক্ষ্য নহে। তবে ঈশ্বরের উপাসনা কি নিমিত্তে? যে ব্যক্তি উত্তর করে, মুক্তি লাভের নিমিত্তে; সেই পণ্ডিতের ন্যায় উত্তর করে। মুক্তিই আমাদের যথার্থ লক্ষ্য স্থান—তাহার আনুসঙ্গিক যাহা কিছু উপকারী, তাহাই আমাদের প্রার্থনার যগ্য। মুক্তির পথে দণ্ডায়মান হইয়া ঈশ্বরের নিকট স্বভাবতঃ আমাদের এই প্রকার প্রার্থনা যায়, যে হে পরমাত্মন! আমাকে পাপ হইতে মুক্ত কর, আমার আত্মাতে পবিত্রতা বিস্তার কর; তুমি আমার নিকটে প্রকাশিত হও; তোমার সহবাসে আমাকে নিরন্তর রক্ষা কর। মুক্তি যদি আমাদের লক্ষ্য হয়, তবে আমরা মধ্য দেশে থাকি। সমুদায় সংসারের কার্যই পরিধি হয়, আর আমরা মধ্যের বিন্দুতে অবস্থিতি করি। এই মধ্য দেশে থাকিলে সকলের সঙ্গেই আমাদের সম্বন্ধ থাকে, কিছুই বিচ্ছিন্ন ভাবে থাকে না। মুক্তি যদি আমাদের লক্ষ্য হয়, তবে আমরা এমত স্থানে আছি, যে সেখান হইতে সমুদয় সংসার আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়— আমরা মধ্য পথে থাকি, আর সমুদায়ই আমারদিগকে আবেষ্টন করিয়া থাকে। শরীর-রক্ষা যে এমত নীচ কার্য্য তাহা অবধি আর আত্মার উৎকর্ষ সাধন পর্য্যন্ত, সকলই আমাদের কর্ত্তব্যের মধ্যে আইসে। মুক্তির প্রতি যাহার লক্ষ্য থাকে তাহার নিকটে সমুদয় নিঃস্বার্থ ধর্ম্ম-কার্য্য নিঃশ্বাসের ন্যায় সহজ হইয়া আইসে। তর্কের উপর লোকবাক্যের উপর, দেশাচারের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার ধর্ম্ম শিক্ষা করিতে হয় না। আপনাকে পবিত্র করিবার জন্য তাঁহার প্রাণগত যত্ন থাকে, কেননা পবিত্রস্বরূপকে লাভ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। মুক্তির দিকে যাঁহার লক্ষ্য থাকে, তাঁহার হৃদয়-গ্রন্থি সমুদয় ভিদ্যমান হয়। আমাদের হৃদয়-গ্রন্থি কি? না মোহ, অজ্ঞান, স্বার্থপরতা। এই সকল গ্রন্থিই আমাদিগকে সংসারপাশে, মৃত্যুর পাশে, বদ্ধ করিয়া রাখে। মুক্তির প্রতি যাঁহার দৃষ্টি থাকে, তিনি পুণ্য পদবীতে সহজেই আরোহণ করিতে থাকেন। আমাদের এমন সকল সঙ্কট-সময় উপস্থিত হয়, এ প্রকার গুরুতর ভার আমাদের উপর চতুর্দ্দিক্ দিয়া পতিত

হয় যে, সেই সময় সেই সকল অবস্থায় আমাদের কর্ত্তব্য কি কিছুই স্থির করিতে পারা যায় না এমন সূক্ষ্ম স্থল এক এক সময়ে উপস্থিত হয়, যাহা গ্রন্থ মধ্যে কেহ কখন উল্লেখ করেন নাই, যাহা অন্যের উপদেশে কখনো শ্রবণ করা যায় নাই; সেই সেই স্থলে কি কর্ত্তব্য তাহা অবধারণ করা কেমন কঠিন। এই সকল স্থলে কি কর্ত্তব্য? শত শত গ্রন্থ মধ্যে শত শত লোকের নিকট হইতে আমরা যে উপদেশ পাই না, এক বার ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি করিয়া সেই সকল বিষয় আলোকের ন্যায় স্পষ্ট দেখিতে পাই, সেই পরম গুরু হইতে শিক্ষা লাভ করি। মুক্তির প্রতি লক্ষ্য থাকিলে ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সকল কর্ম্মেই যোগ থাকে। অন্যেরা যেখানে রাশি রাশি কর্ত্তব্য ভাবে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, আমাদের নিকটে সে সকল কর্ত্তব্য একীভাব ধারণ করে। অন্যেরা যে স্থলে কর্ত্তব্য কি ভাবিয়াই স্থির করিতে পারে না, সেই সকল স্থানে ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি করিয়া আমরা যথা উপদেশ প্রাপ্ত হই। অন্যেরা যেখানে একাকী আপন ক্ষুদ্র বলে পাপের সহিত সংগ্রাম করিতে প্রবৃত্ত হয়, সেখানে আমরা ঈশ্বরকেই সহায় পাই—তাঁহার নিকটে আপনাকে সমর্পণ করিয়া চতুর্গুণ বল প্রাপ্ত হই। অন্যেরা যখন একবার পতিত হইয়া নিরাশ-নীরে পতিত হয়, ঈশ্বর স্বীয় ক্রোড় বিস্তার করিয়া দিলেও তাঁহাকে আশ্রয় করতে যায় না; আমরা সে সময়ে সেই পতিত-পাবনের শরণাপন্ন হইয়া আবার উদ্ধার হই। যাহাতে আমরা সকল বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া পুনর্ব্বার তাঁহার নিকটে যাইতে পারি, তিনি এই প্রকার শুভ বুদ্ধি প্রেরণ করেন, বলবীর্য্য প্রদান করেন।

মুক্তি কি? না সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া। মৃত্যুর পাশ হইতে প্রমুক্ত হইয়া অমৃতের দিকে অগ্রসর হওয়া। বিষয়াকর্ষণ হইতে বিমুক্ত হইয়া বিষয়ের অতীত পদার্থকে আশ্রয় করা। যত কাল আমরা সংসার বন্ধনেই বদ্ধ থাকি, তত দিন আমাদের বদ্ধ ভাব। যত দিন বিষয়ের সঙ্গে জড়িত থাকি, তত দিন মৃতুর পাশেই বদ্ধ হইয়া থাকি। আমরা অন্তরে মুক্ত না হইলে মুক্তির ভাব বুঝিতে পারি না। আমরা এখানে মৃত্যু আর অমৃতের সন্ধিস্থলে রহিয়াছি। মৃত্যু হইতে অমৃতের দিকে যত যাইতে থাকি, ততই আমাদের মুক্তভাব উপলব্ধি হইতে থাকে। আমাদের জ্ঞান ও ভাব ও ইচ্ছা সকলকেই একত্র করিয়া ঈশ্বরেতে যতই সমর্পণ করিতে পারিব, ততই আমরা মুক্তির অবস্থা প্রাপ্ত হইতে থাকিব। যখন ঈশ্বরের সঙ্গে আর আমাদের বিবাদ থাকিবে না, তখনই আমাদের যথার্থ মোক্ষাবস্থা হইবে।

ঈশ্বরের সঙ্গে বিবাদ কি? দ্যুলোক, ভূলোক, চন্দ্র, সূর্য্য, পৃথিবী, সকলই যাঁহার এক রাজ-দণ্ডের উপর চলিতেছে, তাঁহার সহিত বিবাদ কে করিতে পারে? কেবল মনুষ্যই কর্ত্তৃত্ব ভার প্রাপ্ত হইয়া অকৃতজ্ঞ ও অসৎ পুত্রের ন্যায় তাঁহার আদিষ্ট ধর্ম্ম-পথের বিপরীত দিকে চলিতে যায় ও শাস্তি ভোগ করে। আমাদের ইচ্ছা কখনো তাঁহার মঙ্গলময়ী ইচ্ছার অনুগামিনী হয়, কখনো বা বিরোধিনী হয়। তাঁহার সহিত কখনো আমাদের সন্ধি থাকে, কখনো বিবাদ থাকে। এই স্বাধীনতা

শক্তি মনুষ্যের প্রতি ঈশ্বরের এক অমূল্য দান। মনুষ্যকে এই অধিকার দিয়া তিনি তাহাকে বলিয়া দিয়াছেন, যে তুমি আপনা হইতে আমার পথে আইস। সকলেই সেই সর্ব্বনিয়ন্তার কার্য্য করিতেছে কিন্তু মনুষ্য কেবল জানিয়া শুনিয়া তাঁহার কার্য্য সম্পন্ন করিতেছে। সমস্ত জগৎ, সমস্ত ঘটনা, তাঁহার মঙ্গল অভিপ্রায় সিদ্ধ করিতেছে; কিন্তু আমরা আপন ইচ্ছাতে সেই অভিপ্রায়ে যোগ দিতেছি। আমরা আপনা হইতে তাঁহাকে সর্ব্বস্ব দান করি, আমারদিগকে স্বাধীন করিবার তাঁহার অভিপ্রায় এই। এস্থলে অনুরোধ, ভয়, বাধ্যতা, এ সকল কিছুই নাই। আমরা আপনা হইতে তাঁহাকে প্রীতি করি, তিনি এই চাহেন। তাঁহার ইচ্ছা এ প্রকার নয় যে আমরা বাধ্য হইয়া তাঁহাকে পূজা করি। তাঁহার শাসন এ প্রকার নয় যে ভয়ে ভয়ে তাঁহাকে মান্য করিতেই হইবে। তিনি এ প্রকার রাজা নহেন, যে আমরা সকলেই তাঁহার ক্রীত দাস। আমরা বিনা অনুরোধে বিনা ভয়ে তাঁহার প্রীতি, তাঁহার মঙ্গলভাব, প্রতীতি করিয়া আপনা হইতে তাঁহাকে যে পূজা অর্পণ করি, সেই তাঁহার যথার্থ পূজা এবং সেই তাঁহার প্রিয় অভিপ্রায়। আমরা তাঁহার যন্ত্র আর তিনি আমাদের যন্ত্রী, আমাদের সহিত তাঁহার এ প্রকার ভাব নহে।

এই প্রকার স্বাধীন করিয়া দিয়াই তিনি আমাদিগকে মুক্তি লাভের অধিকারী করিয়াছেন। তিনি যদি আমাদিগাকে এ প্রকার করিয়া দিতেন যে যন্ত্রের ন্যায় তাঁহার কার্য্য করিয়াই যাইব, তাহা হইলে আমরা মুক্তির কোন অর্থই পাইতাম না। তিনি আমাদের সকল শক্তির নেতা রূপে আমাদিগকে একটি কর্ত্তৃত্ব শক্তি দিয়াছেন। এই কর্ত্তৃত্ব শক্তি হইতেই আমরা মুক্তির ভাব বিশেষ বুঝিতেছি। আমরা তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া মুক্তি লাভ করিব, তাঁহার যদি এই অভিপ্রায় না থাকিত, তবে আমাদের কর্ততৃত্ব থাকার বিশেষ অভিসন্ধি প্রকাশ পাইত না। আমাদের দিয়া কি সংসারের উন্নতি হইবে? সুখ-প্রবাহ বৃদ্ধি হইবে? সভ্যতা বিস্তার হইবে? জন-সমাজের শ্রীবিদ্ধি হইবে? এই উদ্দেশে কি তিনি আমাদিগকে কর্ত্তৃত্ব দিয়াছেন। তিনি যদি কর্ত্তৃত্ব না দিয়া আমাদিগকে যন্ত্র করিয়া নির্ম্মাণ করিতেন, তাহা হইলেও কি সেই সকল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইত না। তিনি যদি আমাদের স্বার্থপরতাকে আরো দূরদর্শী করিয়া দিতেন, আমাদের লোকানুরাগ-প্রবৃত্তি আরো তেজস্বিনী করিয়া দিতেন, তাহা হইলে কি জন-সমাজের শৃঙ্খলা রক্ষা হইত না? সুখই যদি আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে কি তিনি আরো প্রচুররূপে সুখ বর্ষণ করিতে পারিতেন না? তিনি আমাদিগকে কর্ত্তৃত্ব দিয়াছেন বলিয়া বরং আমরা অনেক সময়ে বিষয়-সুখ হইতে বঞ্চিতই হইতেছি। সুখই যদি আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে কি তিনি আমাদিগকে পশুর ন্যায় প্রকৃতির অধীন করিয়া সুখী করিতে পারিতেন না। আমরা কর্ত্তৃত্ব পাইয়া এই দেখিতেছি, যে বিষয় সুখের প্রতিকূলেই অনেক সময়ে যাইতে হয়। আমরা বিষয়াকর্ষণ অতিক্রম করিয়া তাঁহার প্রদর্শিত পুণ্য পথে যাইতে পারি, এখানকার সমুদয় শিক্ষার তাৎপর্য্যই এই। আমরা এখান হইতেই মুক্তির আস্বাদন প্রাপ্ত

হইতেছি। বিষয়ের প্রতিকূলে—লোকের প্রতিকূলে—পাপের প্রতিকূলে আমাদের কর্ত্তৃত্ব যত চিন্তার করিতে পারি, ততই আমাদের মুক্ত ভাব উপলব্ধি করিতে পারি। আমরা এখানে আমাদের কুপ্রবৃত্তিকে যেমন একবার পরাজয় করিতে পারি, ভবিষ্যতের জন্য ততটুকু বল পাই—পরে পরে আরো সহজে তাহাকে অতিক্রম করিতে পারি। আমরা যেমন পাপ হইতে মুক্ত হইতে থাকি, পাপকে অতিক্রম করিবার বলও প্রাপ্ত হইতে থাকি, আবার বলও যেমন বৃদ্ধি হয়, বিমুক্তিও তেমনি সহজে লাভ করিতে থাকি। আমরা জীবদ্দশাতেই মুক্তির আস্বাদ প্রাপ্ত হই।

আমরা এখান হইতে সেই মুক্তির সোপানে পদ নিঃক্ষেপ করিতেছি। ঈশ্বরকে এখানেই উপভোগ করিতেছি। আমাদের জ্ঞানজ্যোতিঃ যত উজ্জ্বল হইতেছে, তাঁহার মহিমা আমাদিগের নিকটে ততই বিকশিত হইতেছে; আমাদের পবিত্রতা ও সাধু-ভাবের যত উন্নতি হইতেছে, তাঁহার মঙ্গলভাব সেই পরিমাণে গ্রহণ করিতেছি। আমরা বিষয়ের প্রতিকূলতা, অবস্থার প্রতিশ্রোত, যত অতিক্রম করিতেছি; সেই অমৃতের দিকে ততই অগ্রসর হইতেছি এবং ব্রহ্মানন্দের ততই আস্বাদ পাইতেছি। দেবলোকে দেবতারা যে আনন্দরস পান করিতেছেন, তাহা এই ব্রহ্মানন্দের উন্নত ভাব। প্রাতঃকাল কি কোন প্রশস্ত সময়ে আমাদের চিত্ত ঈশ্বরে সন্নিবেশিত হইয়া যখন আমাদের লোম হর্ষণ হয়, হৃদয় কম্পিত হয়, আমরা গভীর পবিত্র স্বর্গীয় আনন্দ উপভোগ করি; তখন সেই প্রেমানন্দেরই আস্বাদন পাই। এখানে আমরা চাতক পক্ষির ন্যায় ঈশ্বরের প্রেম বিন্দুর প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া রহিয়াছি, সেই বিন্দু ক্রমে সাগর হইয়া উঠিবে। আমরা যখন সেই অনন্ত প্রেমসাগরে নিমগ্ন হইব, তখন আমাদের হৃদয়ে শোক মোহ; বিলাপ ক্রন্দন; পাপ তাপ আর কিছুই থাকিরে না; কেবল যোগানন্দের উৎস, প্রেমানন্দের উৎস, ব্রহ্মানন্দের উৎস, নিরন্তর উৎসারিত হইতে থাকিবে।

দশম উপদেশ।

মুক্তি।

মুক্তি? ইহার সহজ উত্তর এই, পাপ হইতে মুক্ত হওয়া, এই উত্তরে মুক্তির সমুদয় ভাব প্রকাশ পায় না। ইহা অভাব পক্ষে মুক্তির লক্ষণ বলা হইল। মুক্তির অবস্থা কেবল অভাবের অবস্থা নহে; পাপের অভাবই যে মুক্তি, তাহা নহে। পশুদিগের অবস্থা এবং শিশুদের নিষ্পাপাবস্থা মুক্তির অবস্থা নহে। যে মনে জ্ঞান প্রীতি এবং কর্ত্তৃত্ব প্রকাশ পাইয়াছে; যে মন আপন বলে সত্যের আশ্রয়ে বিষয়াসক্তি হইতে মুক্ত হইয়াছে; সেই মুক্ত। তখনই মুক্তাবস্থা, যখন ধর্ম্মের বল, পবিত্রতার বল, বিষয়ের প্রতিকূলে, প্রবৃত্তির প্রতিকূলে, লোকের প্রতিকূলে চালিত হয়, যখন জ্ঞান প্রীতি ও ইচ্ছা মুক্ত ভাবে কার্য্য করিতে থাকে। তিনি মুক্ত, যিনি ঈশ্বরের বিশ্বাসে উন্নত হইয়া যুধর্ম্মদ্ধে আসুরিক বৃত্তি-সকলকে দমন করেন এবং নীচ বিষয়-পাশ হইতে মুক্ত হইয়া উন্নত পবিত্র বিষয়ে আপনাকে নিয়োগ করেন। তিনিই মুক্ত, যিনি ঈশ্বরকে আপন সহায় জানিয়া তাঁহার হৃদয় লিখিত পবিত্র ধর্ম্ম আপন ইচ্ছাতে অবলম্বন করেন; তাঁহারই অনুযায়ী হইয়া আপনাকে নিয়মিত করেন; এবং সকল অবস্থাতেই আপনার কর্ত্তব্য সাধন করিয়া ঈশ্বরের মহিমাকে মহীয়ান্ করেন।

সর্ব্ব মঙ্গলালয় পরমেশ্বর আমাদের আত্মাকে বলীয়ান্ করিবার জন্য আমারদিগকে লোভ এবং বিপদের দ্বারা আবৃত করিয়াছেন। তিনি আমাদিগকে এমন এক সংসারে স্থাপন করিয়াছেন, যেখানে অসৎ কর্ম্ম বহু প্রত্যাশা যুক্ত। যেখানে কর্ত্তব্যের পথ অসরল ও কন্টকাবৃত, যেখানে নানা প্রলোভন আমাদের অন্তরের প্রহরীকে আক্রমণ করিতেছে; যেখানে মন অনেক সময় দেহ ভারে আক্রান্ত হইতেছে এবং বিষয় জাল আমারদিকে অনেক সময় ধর্ম্ম ও ঈশ্বর হইতে বিচ্যুত করিতেছে। এই সকল বিপত্তিকে অতিক্রম করিতে করিতেই আমাদের মুক্তাবস্থা আরম্ভ হয়।

সেই আত্মাই মুক্ত যে আত্মা ইন্দ্রিয় সকলকে বশীভূত করে, যে সাংসারিক সুখ দুঃখেই একান্ত আক্রান্ত না হয়, যে আহার নিদ্রা আমোদ প্রমোদেই জীবন ব্যয় করে না কিন্তু ঈশ্বরের জন্যই ক্ষুধিত ও ভূষিত হইয়া জীবন যাপন করে।

সেই আত্মাই মুক্ত, যে বিষয় আসক্তিকে অতিক্রম করিতে পারে; যে জড়ময় পৃথিবীতে বদ্ধ থাকিয়া ইহাকে কারা-গৃহ তুল্য করিয়া না ফেলে; কিন্তু এই স্থূল আবরণের মধ্য হইতে সর্ব্বাতীত পরমেশ্বরে গমন করে এবং সেই অনন্তের নামাক্ষর সর্ব্বত্র পাঠ করিয়া আপনাকে উন্নত করে।

সেই আত্মাই মুক্ত, যে সংসারের অনুরোধ অপেক্ষা ঈশ্বরের অনুরোধ গুরুতর জ্ঞান করে; যে দেশাচারের নিকটেই অবনত না হয়, পৈতৃক ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াই তুষ্ট না থাকে; যেখান হইতেই হউক সত্যের আলোক পাইলেই আদর পূর্ব্বক গ্রহণ করে এবং মনুষ্যের উপদেশ অন্তরের ধর্ম্মোপদেশকে অতিক্রম করিতে না দেয়।

সেই আত্মাই মুক্ত, যাহার প্রীতি সঙ্কীর্ণ নহে; যে এক দেশে বা এক সম্প্রদায়ের মধ্যে বদ্ধ নহে; যে সকলের প্রতি প্রসন্ন ভাবে দৃষ্টি করে; যে আলস্য অহঙ্কার স্বার্থপরতা অতিক্রম করিয়া হৃদয়-গ্রন্থি-সকল ছেদন করে এবং ঈশ্বরের জন্য আপনার সর্ব্বস্ব বলিদান দিতেও প্রস্তুত থাকে।

সেই আত্মাই মুক্ত, যে আত্মা বাহিরের অবস্থাতেই সংরচিত হয় না; ঘটনার স্রোতেই নীয়মান হয় না; যে প্রবৃত্তির অধীনতাতেই কার্য্য করে না; কিন্তু আপনার জীবনের সঙ্কল্প স্থির রাখিয়া সকল ঘটনা, সকল অবস্থাকেই, আপনার উন্নতির অনুকূল করে।

সেই আত্মাই মুক্ত, যে ধর্ম্ম-বলে সবল হইয়া পূর্ণ মঙ্গল স্বরূপ ঈশ্বরে আন্তরিক বিশ্বাস স্থাপন করিয়া সকল ভয় পরিত্যাগ করে; পাপকে যাহার সকল বিপদের মধ্যে ভয়ানক বিপদ্ মনে হয়; কোন ভর্ৎসনা, কোন নির্যাতনা, যাহাকে ধর্ম্ম-পথ হইতে ভ্রষ্ট করিতে সমর্থ হয় না; যে এই অস্থায়ী স্থূল বাহ্য বিষয় হইতে নিবৃত্ত দু হইয়া বিষয়াতীত নিত্য ভূমা পরমেশ্বরের সঙ্গে সম্বদ্ধ নিবদ্ধ করে এবং তাঁহার অখণ্ড মঙ্গল-স্বরূপে নির্ভর করিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করে।

আমাদের জ্ঞান ও ভাব ও ইচ্ছা ঈশ্বরের জ্ঞান প্রীতি ও ইচ্ছার সহিত যত মিলিত হইবে; তত আমাদের আত্মা মুক্ত ভাব ধারণ করিবে। জ্ঞান ব্যতীত আমরা মুক্ত হইতে পারি না; কেন না স্বাধীনতা জ্ঞানজ্যোতি হইতে পরিচ্যুত হইলে তাহা অন্ধ শক্তির ন্যায় কার্য্য করে। মঙ্গল ভাব ব্যতীতও আমরা মুক্ত হইতে পারি না, কেননা নীচ পশু-ভাবের অধীন হইলে আমাদের প্রকৃতি নিতান্ত হীন ও মলিন হইয়া থাকে। আমাদের জ্ঞানের মুক্তাবস্থায় সেই সত্য-স্বরূপ আমাদের জ্ঞানের অন্ন হইবেন, তাঁহার মহিমা আরো উজ্জ্বল রূপে দেখিতে পাইব। আমাদের ভাবসকল তখন মুক্ত হইবে, যখন তাহারা ঈশ্বর-প্রীতির পরূ ধারণ করিবে; যখন

সত্যেতে মঙ্গলেতে তাহারা সমর্পিত হইবে। ইচ্ছার মুক্ত ভাব তখন হইবে, যখন তাহা নীচ বিষয়াকর্ষণ অতিক্রম করিয়া পূর্ণ সত্য, পূর্ণ মঙ্গলের অনুযায়ী হইবে। আমাদের বদ্ধ-ভাব গিয়া মুক্ত-ভাব ক্রমে হইতে থাকে। ঈশ্বরই এক মাত্র শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বরূপ। তাঁহার জ্ঞান মোহেতে আচ্ছন্ন নহে; তাঁহার প্রীতির সঙ্গে দ্বেষের যোগ নাই; তাঁহার ইচ্ছা মঙ্গলের বিরোধিনী নহে; কিন্তু আমাদের যে জ্ঞান, ভাব ও ইচ্ছা, তাহা অল্পে অল্পে শুদ্ধ ভাব ও স্বাধীন ভাব ধারণ করে। অজ্ঞান পাশ কুটিলতার পাশ বিষয় বন্ধন হইতে আমরা ক্রমে মুক্ত হই। যে অবধি আমাদের জ্ঞান, প্রীতি ও কর্ত্তৃত্ব পরিষ্ফুটিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, সেই অবধি আমরা মুক্তি লাভের অধিকারী হইয়াছি এবং তাহারা যত বিবৃত হইবে, মুক্তির অবস্থা ততই গ্রহণ করতে থাকিব। আমাদের জ্ঞান যত ঈশ্বরের জ্ঞানের অনুগামী হইবে;—প্রীতি যত তাঁহার প্রীতিতে মিলিত হইবে; ইচ্ছা যত তাঁহার ইচ্ছার অনুযায়িনী হইবে; ততই আমাদের মুক্ত ভাব। আমাদের জ্ঞান ও ভাব ও ইচ্ছা, সেই সত্য সুন্দর মঙ্গল-পূর্ণ পুরুষের সহিত যত ঐক্য হইতে থাকিবে, ততই তাহারা মুক্তির অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। আমাদের ইচ্ছা যখন তাঁহার ইচ্ছার সহিত মিলিত হইয়া আমাদের অন্তরে ভূলোক ও দ্যুলোকের সামঞ্জস্য শৃঙ্খলা বিরাজ করিতে থাকিবে, তখনই আমাদের মোক্ষাবস্থা। যখন সত্য-জ্যোতিতে জ্ঞান উজ্জ্বল হইবে, প্রীতির শিখায় হৃদয় উদ্দীপ্ত হইবে, বল পবিত্রতা ও উন্নত আশা আমাদের সমুদয় প্রকৃতিকে উজ্জ্বলিত করিবে, তখনই মুক্তি। সেই অমৃতের সঙ্গে যোগ হইলেই আমরা অমৃত সূর্য্য কিরণে বাস করতে থাকি।

এই মুক্তি লাভ করা আমারদের অনন্তকাল সাধ্য। ঈশ্বরের পূর্ণ জ্ঞান, পূর্ণ ইচ্ছার সহিত মিলিত হইতে আমাদের অনন্ত জীবন গত হইবে। এখানে আমাদের মৃত্যু পর্য্যন্ত একটী কালের নির্দ্দেশ আছে। এখানে আমাদের এক পাঠ সাঙ্গ হইয়া গেল। কিন্তু পৃথিবীই আমাদের শিক্ষার শেষ স্থল নহে। এখন এক কাল, এজীবনের পর অবধি নিত্য কাল আরম্ভ হইবে। এখানে কেবল সংসারের সঙ্গে যোগ, ঈশ্বরের সহিত কিছু মাত্র যোগ নাই, মৃত্যুর পর অবধি ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ হইবে; এমত নহে। ঈশ্বর আমাদের একালেরও ঈশ্বর, আমাদের পরকালেরও ঈশ্বর। এ জীবন আমাদের পরজীবনের অনুক্রমণিকা। মুক্তির সোপান এই পৃথিবী লোকেই স্থাপিত রহিয়াছে। এই প্রথম শ্রেণীর পাঠ অভ্যাস করিয়া পরে নূতন নূতন পাঠ অভ্যাস করিতে পাইব। আমরা অমৃতের অধিকারী, অমাদের ক্রমিক উন্নতিই হইবে। জ্ঞান, ধর্ম, প্রীতি, পবিত্রতা, ক্রমিক উন্নত ভাব ধারণ করিবে। আমাদের এ জীবন অনন্ত কালের অন্তর্ব্বর্ত্তী। বর্ত্তমানকাল অনন্তকাল হইতে বিচ্ছিন্ন নহে। এই জীবদ্দশাতেই আমরা মুক্তির পথে পদ নিক্ষেপ করিতেছি এবং অনন্তকাল পর্য্যন্ত সেই পথে অগ্রসর হইতে থাকিব।

এই পৃথিবী লোক হইতে আমাদের উৎকৃষ্ট লোক কি হইবে? সেই লোক, যেখানে পবিত্র প্রেম এবং নির্ম্মলানন্দ বহমান হইতেছে; যেখানে ঈশ্বর-প্রীতি হৃদয়কে উৎফুল্ল করিতেছে; তাঁহার ইচ্ছা সম্পন্ন করিতেই সকলের আনন্দ জন্মিতেছে। সেই লোকই দেবলোক, যেখানে আমরা ঈশ্বরের অধিকতর নিকটবর্ত্তী হইতে পারিব, যেখানে তামাদের জ্ঞান, ভাব ও ইচ্ছা ঈশ্বরের জ্ঞান, প্রীতি ও ইচ্ছার সহিত অধিক মিলিত হইবে। সেই স্বর্গ লোক, সেই পুণ্য ধাম। দেবতারা দেব নাম কেন ধারণ করিয়াছেন; কেন না ঈশ্বরের উপাসনাতেই তাঁহারা নিরন্তর নিমগ্ন আছেন। “মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বে দেবাউপাসতে" তাঁহাতেই তাঁহাদের আনন্দ, তাঁহাতেই তাঁহাদের জীবন। মনুষ্যের ও দেবভাব তাছে; কিন্তু সকল সময়ে তিনি সেই পবিত্র-ভাব রক্ষা করিতে পারেন না। এই হেতু তাহারা দেব নামের যোগ্য নহেন। এই পৃথিবীতেই আমরা স্বর্গ নরক উভয়েরই আভাস পাইতেছি। আত্মার প্রকৃত সুস্থবস্থা—তাহার নির্মল সুশৃঙ্খল ভাবই স্বর্গ। আত্মার বিকৃতাবস্থা, তাহার সমল দূষিত ভাবই নরক। পাপাত্মাকে স্বর্গলোকে রাখিলে তাহার কি হইতে পারে? চির রোগীকে তাহার অন্ধকার কুটীর হইতে সুসজ্জিত প্রাসাদে আলিয়া রাখি বল তাহার কি হইবে? সে যে স্থানে থাকুক, সকল স্থানই তাহার নরক তুল্য বোধ হয়। যে ব্যক্তি কোন দুঃসহ মনস্তাপ ভোগ করিতেছে, বসন্ত কালের মলয়ানিল, যাহা সুস্থ ব্যক্তির প্রাণ-তুল্য, তাহা তাহার যন্ত্রণাদায়ক। পাপীরও সেই প্রকার। যদি পাপাত্মাকে স্বর্গলোকে দের মণ্ডলীর মধ্যে রাখা যায়, তবে তাহার স্বর্গভোগ নহে, তাআই তাহার অতি কঠোর শাস্তি। যে সকল পুণ্যা আর ঈশ্বরের আনন্দ অধিক ভোগ করিতেছেন, তাঁহার জ্ঞান, প্রীতি, প্রচুর ভাবে অর্জন করিতেছেন, তাঁহারদিগের মধ্যে উন্নত পবিত্র জীবেরাই থাকিতে পারে!

স্বর্গলোকে ঈশ্বরের প্রচুর ভাব পাওয়া যাইবে। জ্ঞান ধর্ম্ম ঈশ্বর প্রীতি আরো উন্নত ভাব ধারণ করিবে। আমরা উন্নত দেবতাদিগের মধ্যে থাকিয়া উৎকৃষ্ট শিক্ষা লাভ করিব। ঈ ঘরের অনুচর হইয়া কার্য করিতেছি, তাঁহার। মন্গল ভাব সম্পন্ন করিতেছি, ইহাতেই আমাদের আনন্দ হইবে। তঁহার মহিমা প্রচার করিয়া, তাহার প্রেম অস্বদন করিয়া, জীবন সার্থক করিব। সেই পবিত্র দেব লোকে যাইবার জন্য পৃথিবী লোকেই প্রস্তুত হইতে হইবে। এখলেই ঈশ্বরের সহিত সম্বন্ধ নিবন্ধ করলে পরে তাহাকে আমরা প্রকৃষ্ট রূপে জানিতে পাইব! এখানকার উপযুক্ত শিক্ষা পাইলে ইহা অপেক্ষা গুরুতর শিক্ষার অধিকারী হইব। আবার সেখানেই যে আমাদের শিক্ষার শেষ হইল, তাহা নহে! তাহা অপেক্ষা আর ও এক উন্নত অবস্থা। ইইবে; তাহা তাপেক্ষা উচচতর ভূমিতে আরোহণ করিতে পারিব। আমাদের জীবন উন্নতির স্রোতেই যাইবে। যাহার জীবন আছে, উন্নতি ব্যতীত তাহার মঙ্গল হয় না। আমরা এস্থান হইতে এমন এক লোকে যাইব; যেখানে ধর্ম ও পবিত্রতার স্রোত বহমান হইতেছে; যেখানে প্রেমানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, উৎসারিত হইতেছে; যেখানে, কি সৌভাগের বিষয়! যেখানে দেবতাদিগের সঙ্গে সম-স্বরে তামরা ঈশ্বরের গুণ গান

করিব, তাঁহাদের সঙ্গে একত্রে তাহার মঙ্গলংঅয় কার্য সম্পন্ন করিব, ভহর মহিমাকে মহীয়ান করিব। কি আনন্দের লোক, তাহার জন্য এমন শত শত জীবন বলিদান দেওয়া যায়। কিন্তু ইহাতেই কি আমাদের উন্নতির শেষ হইল? না, এখনো নহে। ঈশ্বর এখনো বলিতেছেন, এ স্থান তোমার সম্পূর্ণ তৃপ্তির স্থল মছে। যদিও এখানে তুমি সহস্র সহস্র আনন্দ ভোগ করিতেছ, যাহা অন্য লোকে পায় নাই; তথাপি এই তোমার শেষ গতি, নহে, তোমার পরম সম্পৎ নহে, তোমার পরম লোক নহে। তখন তুমি আশ্চর্য্য হইবে এবং ঈশ্বরের প্রেম ও করুণ আশ্চর্য্যরূপে অনুভব করিবে। এখানেই আমাদের আত্মার উন্নতি স্পষ্টরূপে অনুভব করা যায়। এক বৎসর পূর্ব্বে ঈশ্বরে আমাদের যে প্রকার অনুরাগ ছিল, এক বৎসর পরে দেখিতে পাই, সে প্রীতি ও অনুরাগ আরো উন্নত হইয়াছে—তাঁহার কার্য্যে অমরা যত সময় ব্যয় করিতাম, তাহা অপেক্ষা অধিক সময় ব্যয় করি; তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিতে যে স্থানে সঙ্কুচিত হইতাম, তাহা এখন অনায়াসে রক্ষা করিতে পারি; তাঁহার জন্য যত টুকু ত্যাগ স্বীকার করিতে ক্ষুণ্ণ হইতাম, তাহা এক্ষণে অনায়াসে স্বীকার করিতে পারি। এই প্রকার উন্নতিতেই আমাদের সমস্ত জীবন যাপন হইবে। এখানকার উন্নতিতে আমাদের অনন্ত কালের মহান্ উন্নতির আভাস মাত্র পাইতেছি। তখন আমাদের জ্ঞান যে কত উজ্জ্বল হইবে, প্রীতি যে কত উন্নত হইবে, ইচ্ছা যে কত সবল হইবে; এখান হইতে তাহা বলিতে পারিনা। এখানে আমরা যে সত্যের আবরণ মাত্র দেখিতে পাই, পরে তাহার মধ্য দেশ দেখিতে পাইব; প্রীতি যেমন এখানে এক দেশ কি এক পরিবারে বদ্ধ আছে, তখন তাহা উদার ভাব ধারণ করিবে—তখন ঈশ্বরের উদার প্রীতি-দৃষ্টিতে আমরা জগৎ দর্শন করিব। এখানে ইচ্ছা সকল সময়ে আপনার প্রকৃত স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারে না, ক্রমে তাহা এমন বলীয়ান্ হইবে যে সে আপনাপনি ধর্ম্মের এবং ঈশ্বরের অনুযায়ী হইবে; প্রত্যেক প্রবৃত্তিকে তাহা অধীনে আনিবে এবং তাহার উপর আপনার প্রকৃত অধিপত্য স্থাপন করিবে। যখন এই প্রকার আমাদের জ্ঞান, প্রীতি ও ইচ্ছা ঈশ্বরের জ্ঞান, প্রীতি, ইচ্ছার সহিত মিলিত হইতে থাকিবে, তখন আমরা মুক্তি লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে থাকিব।

ব্রাহ্মধর্মের এই প্রকার মুক্তির ভাব অন্যান্য ধর্ম্মের সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে এ ধর্ম্মের মাহাত্ম্য স্পষ্ট রূপে বুঝা যায়। কোন কোন পণ্ডিতেরা বলেন, জীবত্ব গিয়া ঈশ্বর হইয়া গেলে জীবের মুক্তি হইবে। ব্রাহ্মধর্মের মুক্তি ঈশ্বরের অধীন হইয়া থাকা; তাঁহাদের মুক্তি ঈশ্বর হইয়া যাওয়া। বস্তুতঃ তাহাতে জীবের ঈশ্বরত্ব হয় না, তাহাকে বিনাশ করিয়া ফেলা হয়। সংসারের অধীন না হইয়া ঈশ্বরের যে অধীনতা, তাহাতেই যথার্থ মুক্তি। যাঁহারা বলেন, জীব ঈশ্বর হইয়া যাইবে, তাঁহারা তাহাকে বিনাশ করিয়া ফেলেন। তাহাতে এই হয় যে ঈশ্বর যেমন আছেন, তেমনই থাকিবেন; জীবেরাই লয় হইয়া যাইবে। আমাদের আন্তরিক

স্পৃহা এই যে ঈশ্বরের অধীন হইয়া থাকি; ঈশ্বর হইয়া যাই, ইহাতে আমাদের কোন ভাবই সায় দেয় না। তাহা হইলে আপনাকে বিনাশ করিয়া ফেলা হয়, ব্রাহ্মধর্ম্মের এ প্রকার নির্ব্বাণ মুক্তি নহে। শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তস্বরূপের অধীন হওয়াই মুক্তি। বৈদান্তিক পণ্ডিতেরা বলেন যে যাহা দেখিতেছি তাহার বাস্তবিক সত্তা নাই; একমাত্র ঈশ্বরই আছেন, আর সকলই অসৎ, সকলই মায়া। তাঁহাদের এ বাক্য কল্পনা মাত্র। এই জগৎ যাহা আমরা দেখিতেছি, তাহা সত্য; কেন না তাহা সেই সত্য স্বরূপ-

কেই অবলম্বন করিয়া আছে। সেই সত্যের আশ্রয়ে এই তাবৎ সত্য রূপে প্রকাশ পাইতেছে, তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেই ইহা অসৎ; কিন্তু বাস্তবিক কিছুই তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে পারে না; তবে আমরা যে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখি, সে আমাদের কল্পনা মাত্র। বৃক্ষকে কি কখন আমরা মূল হইতে বিচ্ছিন্ন মনে করিতে পারি? না জগৎ সংসারকে জগৎ কর্ত্তা হইতে বিচ্ছিন্ন মনে করিতে পারি? তাঁহার আশ্রয়ে থাকিয়া এই জগৎ সত্য রূপে প্রতিভাত হইতেছে। বৈদান্তিক মতের প্রধান পোষক যে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য, তাঁহার সিদ্ধান্ত এই যে আমরা সংসার হইতে উপরত হইয়া ও কর্ম্মের ফলাফলে নিরাকাঙ্ক্ষী হইয়া পর ব্রহ্মের উপাসনা করিলে তাঁহার সহিত এক হইয়া যাই; তাঁহাতে আর আমাতে কোন প্রভেদ থাকে না। হীনমতি কুলোকের হস্তে এই মত পড়িয়া তাহার ফল এই হইয়াছে যে তাহাদের মধ্যে পাপ-প্রবাহ বৃদ্ধি পাইয়াছে; তাহারা বলে আমি যাহা করিতেছি, ঈশ্বরই করিতেছেন; আমি পাপ পুণ্যের ভাগী নহি।

> জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তির্জানান্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।
> ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন
> যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করেমি।

এই সমস্ত মত ব্রাহ্মধর্মের সম্পূর্ণ বিরোধী। আমরা ঈশ্বরের অনুচর হইয়া তাঁহার অধীনতাতেই চির কাল থাকিব। যতক্ষণ তাঁহার অধীন না থাকি, ততক্ষণ আমাদের মুক্তভাব নহে সংসারের অধীনতাতেই বদ্ধ ভাব, ঈশ্বরের অধীনতাতেই মুক্ত ভাব। "যদা সর্ব্বে প্রভিদ্যন্তে হৃদয়স্যেহ গ্রন্থয়ঃ। অর্থ মর্ত্তোঽমৃতোভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে" যখন আমাদের মোহ, স্বার্থপরতা, দ্বেষ, কুটিলতা, এই সকল হৃদয়গ্রন্থি ভিদ্যমান হইবে; যখন আমরা ঈশ্বরকে সর্ব্বস্ব দান করিব; কেবল ফুল চন্দন নয়, কিন্তু প্রাণ মন সকলই তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিব, তখনই আমাদের মুক্তি লাভ হইবে; তখন মর্ত্ত্য হইয়াও আমরা অমৃত হইব।

অতএব ব্রাহ্মধর্ম্মের মুক্তি ব্রহ্মেতে লয় হওয়া নহে; ব্রাহ্ম ধর্ম্মের মুক্তি আত্মার অনন্ত কালের উন্নতি! ব্রাহ্মধর্ম্ম এ প্রকারও উপদেশ দেন না যে অন্যের হস্তে মুক্তির ভার সমর্পণ করিয়া আমরা মুক্ত হইব, কোন মানব দেবতা কি কোন ধর্ম্মযাজক আমাদের জন্য মুক্তি আনিয়া দিবেন। ব্রাহ্মদের বিশ্বাস ইহা নয় যে পুরাকালের কোন নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণে আমরা একেবারে পতিত হইয়াছি; আমারদিগকে ঈশ্বরেরও ত্রাণ করিবার সাধ্য নাই; আমাদের অনুতাপও কোন কার্য্যের নহে; এক জন মানব-দেবতার সহায়তা চাই। ব্রাহ্মধর্ম্মের মতে ঈশ্বরই আমারদের মুক্তিদাতা, তিনিই আমারদের পরিত্রাতা। আমরা "আত্ম প্রভাবাৎ দেব প্রসাদাৎ" ঈশ্বরের প্রসাদে ও স্বীয় যত্নে অন্তরে মুক্ত না হইলে তীর্থ-দর্শনে বা গঙ্গা স্নানে বা কোন ঐন্দ্রজালিক ব্যাপারে আমারদের মুক্তি হইবে না। আমারদের মুক্তি এই পৃথিবীর মধ্যে কি কোন একটি স্বর্গ লো-

কের মধ্যেই বদ্ধ নহে; কিন্তু ঈশ্বর প্রসাদে তাঁহার আশ্রয়ে আমরা চিরকাল থাকিয়া মুক্তির পথে উৎকৃষ্ট হইতে উৎকৃষ্টতর স্বর্গে অনন্ত কাল পর্যন্ত অগ্রসর হইতে থাকিব। ব্রাহ্মধর্ম্মের এই স্বর্গ, এই মুক্তি।

সমাপ্ত।

— ☆☆ —

🔸 Contributor 🔸

🤖 This ebook is auto generated using python from WikiSource (উইকিসংকলন) by bongboi. Thanks to the volunteers over wikisource:

- Salil Kumar Mukherjee
- Bodhisattwa
- Nettime Sujata
- Suman Das 2021
- Sumasa
- Inductiveload
- Ignacio Rodríguez
- Jayantanth

🙂 Wikipedia has it's own epub generation system but somehow due to weird Styling and Font embedding those EPUBs invariably slows down the device in which you're reading. And Fonts get broken, some group members on t.me/bongboi_req reported this, so decided to build those concisely via Python.

✌️ Utmost care have been taken but due to non-survilance some ebook parts may be broken. If you find such please improve and submit or report to @bongboi_req. So that those can be improved in future

🔸 Disclaimer 🔸

⚠️

⚔️ Tele Boi does not own any content of this book. All the copyright is of respective authors/publishers of the books. @bongboi compiled this for Non-profit, educational and personal use, in favour of fair use.

🌏 The content of the book is publically available in the WikiSource.

🔥 Do Not redistribute in a commercial way.

✅ Please buy the hardcopy of the books to support your favourite authors and/or publishers.

🔸 সমাপ্তি 🔸

পড়ে ভাল লাগলে বই কিনে রাখুন।

🖤 করোনার প্রকোপের সময় বানানো বইগুলি। সবাই সুস্থ থাকুন, সুস্থ রাখুন।

🔊 Bengali Language have very few EPUBs created. @bongboi started creating this as a hobby project and made more than 2000 EPUBs at this stage.

🌟 Be a volunteer @bongboi or at WikiSource so that more ebooks become available to the public at large.

Help People Help Yourself ❤️

আরও বই ⏬

টেলি বই

MOBI